শরশয্যায় ভারতকেশরী তাঁহার অন্তিম দিনলিপি

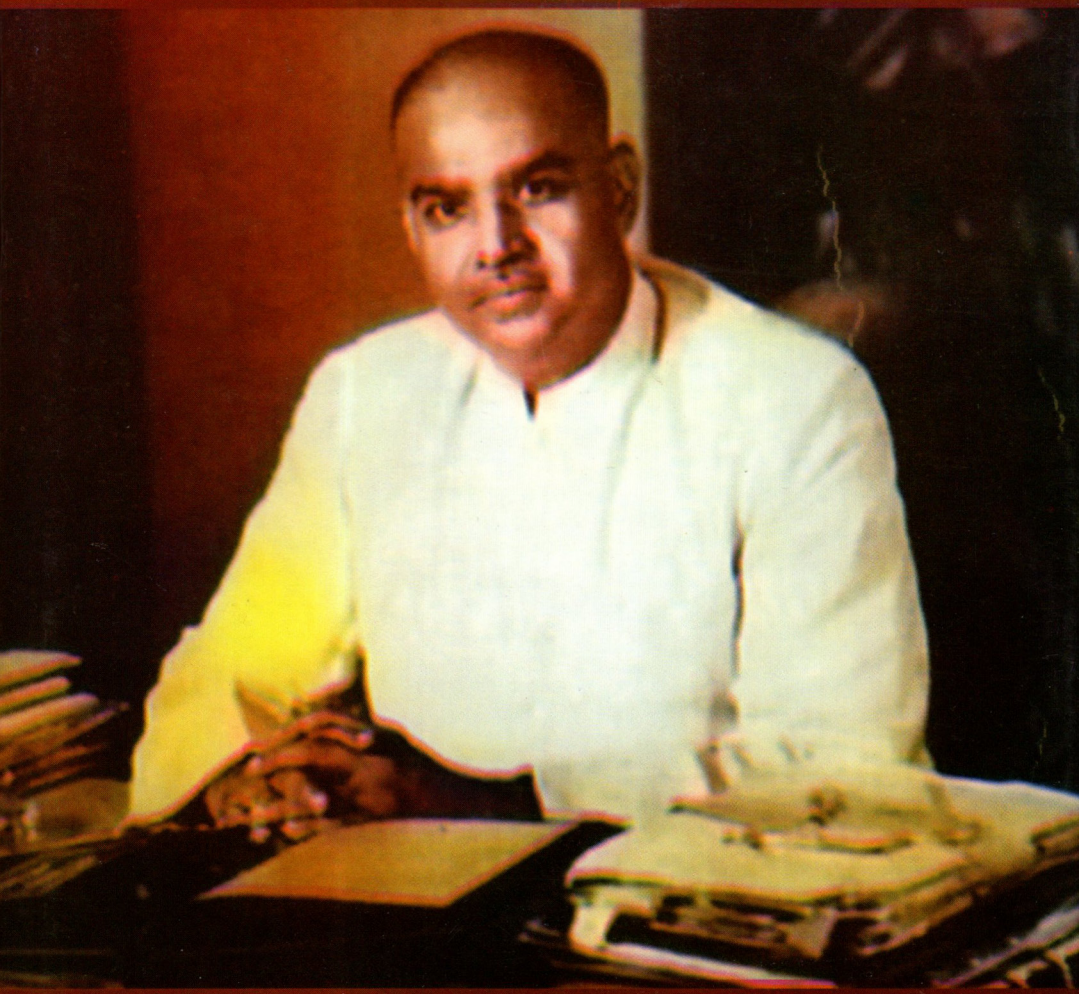

ডাঃ জে সি পাল এবং সোনালী মুখার্জী

শরশয্যায় ভারতকেশরী
তাঁহার অন্তিম দিনলিপি

ডাঃ জে. সি. পাল

এবং

সোনালী মুখার্জী

টুইন্স
প্রকাশনী

Sara Sajyae Bharat Keshari : Tahar Antim Dinalipi
by Dr. J. C. Pal & Sonali Mukherjee

ISBN 978-93-5346-814-9

প্রকাশক

গীতিকা মাইতি

তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬

ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ tuhinaprakashanikol@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ আগরতলা বইমেলা, ২০১৯

বর্ণ সংস্থাপন ও মুদ্রণ

মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং

২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, ফোন ঃ ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬

ই-মেল ঃ mahamayapress@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন ঃ ৯১২৩৮৩৯২৬৭

মূল্য ঃ ১৬০.০০ টাকা

গ্রন্থকারদ্বয়ের নিবেদন

এই পুস্তকের রচয়িতা একজন অশীতিপর শল্য চিকিৎসক যিনি ছাত্রাবস্থায় শ্যামাপ্রসাদকে মোটামুটি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। ডাঃ মুখার্জী কার্যত শেখ আব্দুল্লার জেল অন্তরীণ অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় পরলোক গমন করেছেন। একজন সাধারণ নাগরিক যে মানবাধিকারের সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। তিনি সেই সব অধিকার পাননি বটে কিন্তু একজন শত্রুপক্ষের যুদ্ধবন্দীকে (POW) যে অধিকারগুলো দেওয়া হয় তিনি তার থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। আজকের মানবাধিকারের মানদণ্ডে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও শেখ আব্দুল্লার সাধারণ বিচারকক্ষে সোর্পদ করা উচিত ছিল। মহম্মদ আলী জিন্নাহ ভারত স্বাধীন হওয়ার ৭০ দিনের মাথায় কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে। কিন্তু নেহরু কু-চক্রে সংবিধানে ৩৭০ ধারা সন্নিবেশিত হয়, তারপর ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আনুকূল্যে ৩৫এ নামক আরও এক বিভেদকারী ফরমান জারী হয়। যার কু-ফল সমস্ত ভারতবাসী এবং ভারতের সেনাবাহিনীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই পুস্তক আশাকরি নূতনভাবে দেশপ্রেম জাগাবে এই আশা রাখি।

গ্রন্থকারদ্বয়

২ অক্টোবর, ২০১৮
কলকাতা

পাঠকগণকে প্রায় ৬৫ বৎসর পশ্চাতে যেতে হবে। দিনটি দেওয়াল লিখনে ২২ জুন ১৯৫৩। ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত্রির নিশানা জানাচ্ছে। ঘটনাস্থল কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর প্রাদেশিক হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের একটি চিকিৎসা কক্ষ। এই কেবিনের পরিধি অনুমান ১২ ফুট বাই ১২ ফুট হবে। চিকিৎসা কক্ষের আসবাবপত্র বলতে একটি তক্তপোষ, একটি চেয়ার, একটি কাঠের টুল। ওই পরিযেবা কক্ষে বিছানায় প্রাণপণভাবে বাঁচার লড়াই করে যাচ্ছেন এক দীর্ঘদেহী বিরল কেশ সমন্বিত সুঠাম চেহারার মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি। এই মৃত্যু পথ যাত্রী তার প্রাণ বাহির হইবার জন্য কাতর আর্তনাদ করে যাচ্ছেন। আমাদের বর্ণিত মৃত্যু পথযাত্রী একজন ভীষণভাবে আক্রান্ত একজন Myocardial Infarction-এর পেশেন্ট। রোগীর অবস্থা রাত্রির প্রথমার্দ্ধ থেকে ক্রমশ অবনতির দিকে পর্যবসিত হয়েছে। রোগী যেহেতু হার্ট ফল্টে আক্রান্ত তাই অস্বাভাবিক বুকের যন্ত্রণায় কাতর। তাঁহার শরীর হিমশীতল ঘর্মাক্ত এবং মনে হইতেছে, যেহেতু এইরূপ রোগীর চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা নেই, তাহার ক্ষীণ প্রাণবায়ু অচিরেই নির্গত হইবে।

এই মধ্যবয়স্ক অন্য কেউ নন। তিনি ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ওই কক্ষে আর একজন কর্তব্যরতা তাহার নাম রামদুলারী টিকু। যেহেতু রোগীর অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠছে ওই সেবিকা বিচলিতভাবে ছটফট করছে। ওই মৃত্যু পথযাত্রী কাতরভাবে রামদুলারীকে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসককে ডাকার জন্য আকুলভাবে আবেদন জানাচ্ছে। যেহেতু ওই রোগীর জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসকের ব্যবস্থা নেই, তাই সেবিকাকে পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের চিকিৎসক ডাঃ জগন্নাথ জুৎসীর জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। ডাঃ জুৎসী যেহেতু নিকটবর্তী নাগালের মধ্যে নেই, তাকে পাবার জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। তাই রামদুলারীকে ডাক্তারবাবুকে আনার জন্য নূর মহম্মদ বলে একজন পিয়ন মারফত ডাক্তার আনার জন্য ছোটাছুটি আরম্ভ হল।

অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ডাঃ জুৎসীকে আনানো গেলো। কিন্তু ডাঃ জুৎসী তো এই রোগী সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাই তিনি টেলিফোন মারফত ডাঃ আলি আহমদের কাছে ফোন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ডাঃ আলি আহমেদ অনেক দূরে রয়েছেন, তাই অনভিজ্ঞ ডাঃ জুৎসী বাস্তবিকভাবে রোগীর কোনো উপকারে এলেন না।

তাই ঘটনাচক্রে ২৩ জুনের মধ্যরাত্রে ২.৩০ মিনিটে বাংলার বাঘ তথা আশুতোষ পুত্র ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের জীবনবাতি এক করুণ ও অমানবিক অবস্থায় নির্বাপিত হলো। বাস্তবিকভাবে ডাঃ আলি রোগীর মৃত্যুর আধঘণ্টা পরে হাসপাতালে পৌঁছুলেন। ডাঃ আলি নিয়মমাফিক

কাগজপত্র প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলেন। ডঃ মুখার্জীর শবদেহ প্রথাগতভাবে সাদা কাপড়ে আচ্ছাদন করা হলো, ডাঃ তাঁর মৃত্যু সময় লিখলেন ভোর ৩.৪০।

এই নিদারুণ ও হৃদয় বিদারক ঘটনার নাটকের কুশীলবরা হলেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, তৎকালীন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা, জাতির জনক শ্রীমোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী, মহারাজা হরি সিং, ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মহম্মদ আলী জিন্নাহ, কাশ্মীর প্রজা পরিষদ নেতা পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান এবং অবশ্যই ভারতের শেষ ভাইসরয় ও স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

প্রধানত প্রথম কুশীলব ঃ- যেহেতু তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি এই পদে দীর্ঘ ১৭ বৎসর ব্রতী ছিলেন (১৯৪৭-১৯৬৪)। অবশ্যম্ভাবী রূপে তার ভূমিকা বিশেষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। পণ্ডিত নেহেরু কাশ্মীরের পণ্ডিত পদবীভুক্ত (বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ পণ্ডিত কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত এদের অবস্থা মায়ানমারের রোহিঙ্গা প্রদেশের রোহিঙ্গাদের চেয়েও খারাপ। এদের সংখ্যা ভারতে ৩ লক্ষের মতো। কেননা কাশ্মিরী পণ্ডিতরা "আপনা দেশমে পরদেশী"। যদিও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু জন্মেছিলেন উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে ১৮৮৯ সালে, তাই তিনি নিজেকে কাশ্মিরী না ভেবে নিজেকে এলাহাবাদের ভূমিপুত্র বলেই মনে করতেন।

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের মাত্র ৭ শতাংশ অধিবাসীর মধ্যে পড়ে। এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার যে জম্মু-কাশ্মীরের ৯০ শতাংশ ভারতের পোষ্য সন্তান আর ১০ শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

কাশ্মীর যখন চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পদানত হলো তখন রাষ্ট্রীয় শাসকদের ইচ্ছানুসারে পণ্ডিতরা মুসলমানদের দ্বারা প্রভাবিত হলো এবং তাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জওহরলালের পূর্বপুরুষ রাজকাউল মুঘল সম্রাট ফারুকশীয়ারের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হয়ে উত্তরপ্রদেশের সমতলভূমিতে নেমে আসেন, তখন যেহেতু কাউলরা একটি নহর অথবা খালের পাশে বাস করতেন তাঁহারা প্রথমে কাউল নেহেরু উপাধি লিখতেন, পরে তাহা সংক্ষিপ্ত হয়ে শুধু নেহেরু উপাধিতে পর্যবসিত হলো। জওহরলালের পিতা মতিলাল পাশ্চাত্য ভাবধারায় মানুষ হয়েছিলেন এবং ভাবধারা ও আদব কায়দায় মোটেই ভারতীয় ভাবধারা ও আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। কলেজের পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই মতিলাল আইন ব্যবসায় নেমে পড়লেন। তাতে তাঁর প্রভূত ধন সামগ্রীর আমদানি হয়েছিলো। আদরের দুলাল নেহেরুর জন্য মতিলাল তাহার একমাত্র পুত্র জওহরলালকে পাশ্চাত্য ঘরানায় শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। মতিলাল তাহার একমাত্র পুত্র

(যদিও তাহার অপর দুটি কন্যা ছিলো) জওহরলালের জন্য একজন ইংরেজ শিক্ষক (মি. ব্রুক)-কে নিয়োগ করলেন। পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মতিলাল সপরিবারে ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলেন। সেটা ১৯০৫ সাল, সেখানে গিয়ে পণ্ডিত নেহেরু ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত শুধু বড়লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হ্যারো (Harrow) স্কুলে ভর্তি হলেন। নেহেরুজীর বয়স তখন সাবে মাত্র ১৫। তারপর ১৯০৭ সালে তিনি ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্ব্রিজে ভর্তি হলেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে ক্যাম্ব্রিজ ট্রাইপজ (Tripos) লাভ করেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডে আইন অধ্যয়ন করলেন এবং ইনার টেম্পলে বার এট্‌লতে নাম নথিভুক্ত করলেন।

নেহেরুর ভারতে প্রত্যাবর্তন ঃ- নেহেরু ১৯১২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তিনি ২৩ বছরের তরতাজা যুবক। তিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন বিলাত প্রীতি ও বিলাতী মূল্যবোধ। বিলাতী মূল্যবোধ বলতে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস। তখনকার ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবেশ, জওহরলাল যখন দেশে ফিরে এলেন ভারতে তখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চলছিল। জওহরলাল এই আন্দোলনকেই বললেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি জাতি বা নেশনের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন জাতির সংজ্ঞা কি? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা জাতির নানারকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। জাতির একটা ধারণা পাওয়া যায় ইতালীয় জাতীয়তাবাদী নেতা ম্যাটসিনীর লেখা থেকে। ম্যাটসিনীর ভাষায় একটি জাতি হলো জৈবিক সমগ্রতায় আবদ্ধ এক জনগোষ্ঠী যাহারা কতকগুলো উপাদানের ব্যাপারে সহমত। এই উপাদানগুলির মধ্যে জাতিগোষ্ঠী, দেশের ভৌগোলিকতা, ঐতিহাসিক পরম্পরা, বৌদ্ধিক বিশেষত্ব, ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপের উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে জাতীয়তাবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাও। কিছু কিছু জাতীয়তাবদী রাষ্ট্র গড়ে উঠে অটোম্যান সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। জওহরলালের চিন্তা চেতনা এই নবোত্থিত জাতীয়তাবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

একশিলাভুক্ত সমাজ ও বহুজন সমাজ (Monolithic & Pluiralistic Society) কিন্তু ভারতবর্ষ ইউরোপ নয়। ভারতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পারস্য বা তুরস্কের মতো Monolithic (একশিলাভুক্ত) সমাজ নেই। ভারতে ইউনিয়ন টেরিটরী সমেত ৩১টা প্রদেশ আছে। ভারতে মানুষ ১২১ ভাষায় কথা বলে। বহু ধর্মের লোক বাস করে। ভারতে বহুজন সমাজ বিরজিত। সমকালীন ভারতবর্ষে (৪০ কোটি জনসাধারণের মধ্যে একচতুর্থাংশ মুসলিম) মুসলমান, তত্ত্বগতভাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে নির্বিশেষে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। ইসলামী জাতীয়তাবাদের নাম মিল্লাত, মিল্লাতের উৎস 620AD সনে। হজরত মহম্মদের

বিখ্যাত মদিনা ঘোষণা এবং ভ্রাতৃত্ববাদের কথা কোরানেও আছে তোমরা তার অনুগ্রহে ভাই হয়ে গেলে। এই ভ্রাতৃত্ববোধেই ইসলামী জাতীয়তাবাদ ও মিল্লাতের ভিত্তি। এক মানুষ, তার দেশ, তার জাতি, তার ভাষা, তার বর্ণ, যাহা হউক না কেন কলিমা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য মুসলমানের ভাই হয়ে যায়। এই ধর্ম্মভিত্তিক একাত্মবোধের নামই মিল্লাত, আমরা এখানে মনে করতে পারি (Organisation of Islamic States) যার সদস্য সংখ্যা। ৫৬ অতিক্রম করেছে। এই ইসলামিক অর্গানাইজেশন ভারতকে তার সদস্য করতে বহুবার আপত্তি করেছে। অথচ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই সংস্থায় সভ্য হওয়ার জন্য মাথা কুটেছেন।

আরব জাতীয়তাবাদ ঃ- ইসলামিক মিল্লাতে পৃথক জাতিতত্ত্ব নেই, ভূগোল নেই, নেই স্বাতন্ত্র্য ঐতিহাসিক পরম্পরা। কলিমা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায় মানুষের পৃথক জাতিতত্ত্ব, মানুষের ঐতিহাসিক পরম্পরা, মানুষের বৌদ্ধিক বিশেষত্ব। সে হয়ে যায় শুধু মুসলমান।

ইউরোপের পুনর্জাগরণ ও ফরাসী বিপ্লবের অবদান ঃ- উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমস্ত ইউরোপ জুড়ে জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান হলো, এই ঐতিহাসিকদের মতে ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বর্ণিত। এই বিপ্লবের বাণী হলো, Liberty, Equality and Fraternity) স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব। ইউরোপীয় ভাবধারার সাম্যবাদ ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয় কারণ ভারতের কাঠামো ওই ভাবধারার পরিপূরক নয়, কিন্তু নেহেরুজী ইউরোপের নব্য-জাতীয়তাবাদের ভক্ত হয়ে উঠলেন।

দেশমাতৃকার প্রতি দায়িত্ববোধ ঃ- ইস্‌লামিক ধর্ম্মাবলম্বীরা শুধু দার-ওল-ইসলাম বা ইসলামের স্থানকে মান্যতা দেয়। তাহারা মাতৃভূমি বা জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে না। জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশীয়তা মিল্লাতের ভাবধারার পরিপন্থী। মিল্লাতের ভাবধারায় আরবের মক্কাই একমাত্র ধর্মীয় পরিক্রমার স্থল, ইসলামের ইতিহাসই একমাত্র ইতিহাস এবং প্রতিটি মুসলমান আরবীয় জাতীয়তাবাদের একটা অংশ, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা দেশকে মাতৃভূমি বলে শ্রদ্ধা কিংবা পূজা করে তাহারা মাতৃবন্দনাকে স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী বলে বন্দনা করে। ইসলামী ভাবধারায় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত পাপ অথবা গুনাহ্ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৮৮২ সালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ এবং মাতৃবন্দনায় আপ্লুত হওয়ায় ইসলামীয় ভাব ধারার পরিপন্থি হয়ে ওঠে হয়ে ওঠে তাই 'জনগণ-মন অধিনায়ক' জাতীয় সংগীত হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়।

প্রত্যাবর্তনের পর তাহার সামাজিক ভাবধারা পরিবর্তন ঃ- নেহেরুজি দেশে ফিরে পূরোপুরি একটা ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার অনুগামী হয়ে উঠলেন। তিনি মঠ, মন্দিরে যাওয়া পুরোপুরি বর্জ্জন করলেন। তিনি ধর্ম্মীয় আচরণকে একটা প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা হিসেবে ভাবলেন। তিনি

ফরাসী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠলেন। ইতিহাস পর্যালোচন করলে দেখা যাবে যে সমস্ত দেশ ধর্মনিরপেক্ষতাকে বরণ করেছিল, তাহারা কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারেনি। শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে যাহারা রাষ্ট্রীয় মূলমন্ত্র হিসাবে নিয়েছিল তাদের মধ্যে মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলোর কথা ভাবা যাক তেমনি সোভিয়েট রাশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ মূলমন্ত্র হিসেবে নিয়ে, ক্রমে সমস্ত দেশটাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

নেহেরুর জীবনীকারের বিশ্লেষণ ঃ- ডাঃ সর্ব্বপল্লী গোপাল নেহেরুর জীবনীকার। নেহেরুজী তাহার Discovery of India বইতে ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার ভাবধারার পরিচয় দিয়েছেন। উক্ত বইতে নেহেরুজী গজনীর সুলতান মাহমুদকে হিন্দুদের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। তাঁর মতে সুলতান মাহমুদ যদিও মন্দির ধ্বংস করাকে পৌত্তলিকতা বিরোধী হিসাবে গণ্য করলেন না। তিনি সুলতান মাহমুদকে শুধু সোনাদানা লুণ্ঠনকারী বললেন। স্বাধীনতার পরে যখন সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ হয়েছিলো তখন পূর্ব নির্দ্ধারিত সূচনা অনুযায়ী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সেই মন্দির উদ্ঘাটন করতে পারলেন না তাহার আকস্মিক প্রয়াণের জন্য। তাই উদ্যোক্তারা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে দিয়ে মন্দির উদ্ঘাটনের জন্য উদ্যোগী হলেন, তখন নেহেরু তার তীব্র বিরোধিতা করলেন, কারণ নেহেরুজীর বক্তব্য ছিলো যে রাষ্ট্রপতি সেই মন্দির উদ্ঘাটন করলে তাহা "অন্যায়ভাবে" হিন্দু পুনর্জীবনে সাহায্য করবে।

নেহেরুজীর মেকী ধর্মনিরপেক্ষতা ও খিলাফত আন্দোলন ঃ- যদি আমরা ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে ঘটনা পরম্পরা বিচার করি, তা হলে দেখতে পাবো যে ইসলামের মধ্যে ধর্মীয় বিচার থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই বেশী। যখন হজরত মহম্মদ দেহত্যাগ করলেন তিনি নিদান দিলেন যে যেহেতু তিনি কুরেশী সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহার অনুসারীরাও কুরেশী সম্প্রদায় ভুক্ত হবেন। তাহার উত্তরাধিকারীরাও কুরেশী সম্প্রদায়ের হতে হবে। এইখানে একটা কথা বলা ভালো যে হজরত মহম্মদের একাধিক বিবাহিত স্ত্রী থাকলেও তাহার কোনও পুত্র সন্তান ছিলো না। হজরতের দেহ রক্ষার পরে মদিনার মুসলমানরা আবুবকরকে তাদের খলিফা নির্বাচন করলেন। তিনি কুরেশীয় সম্প্রদায় ছিলেন। তখন মদিনায় মুসলমানরা দু'ভাগ হয়ে গেলো। তখন ওমাইয়া গোষ্ঠীর মোবেয়া এবং হাসেমাইত গোষ্ঠীর হাসান-হুসেনের গোষ্ঠীর মধ্যে কারবালায় প্রান্তরে দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধ নিয়ে আজও তারা বড় বড় শহরের রাস্তায় মহরম অনুষ্ঠান পালন করেন এবং মুসলমানরা সিয়া সুন্নী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আজও মিটলো না।

আবুবকরের পর ক্রমান্বয়ে খলিফা নির্বাচিত হলেন ওমর, ওসমান এবং আলি। তারপর ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ওমাইয়া শ্রেণীভুক্তরা শক্তির দাপটে হেরে গেলেন ও আবিসিনীয় গোষ্ঠীভুক্তরা জিতে গেলেন এবং খলিফার প্রধান কেন্দ্র বাগদাদে স্থানান্তরিত হলো। তুরস্কের রাজধানী

ইস্তাম্বুলে খলিফার প্রধান কেন্দ্র তখন থাকলেও তুরস্ক এখন আর প্রতিক্রিয়াশীল নেই। তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের জন্য এখন প্রায় একটা প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

অটোমান সাম্রাজ্যের খণ্ড বিখণ্ড হওয়া ঃ- যেহেতু অটোমান রাজত্ব তুর্ক অধিবাসীর না হওয়ায় অটোমান সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে খণ্ড বিখণ্ড হতে আরম্ভ করলো। ইউরোপের বুকে শিল্প বিপ্লব হওয়ায় নতুন নতুন শিল্প পরিসম্ভার বাজারে এলো। এই অর্থব্যবস্থাও ভারতের বুকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য ভারতেও মুসলমান সমাজ ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়তে লাগলো। যদিও প্রাক্তন আমেরিকান রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামা নতুন দিল্লীতে এক বক্তৃতায় ভারতের মুসলমানদের আরও বেশী করে ভারতীয় হওয়ার জন্য মত প্রকাশ করেন, কিন্তু ভারতে মোল্লাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এটা হতে দেবে না।

সার্বিক ইসলামের দাওয়াই ঃ- যদিও জওহরলাল হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন, তিনি কিন্তু ইসলামী মৌলবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। তিনি সমর্থন করেছিলেন, মৌলবাদী খিলাফত আন্দোলন। যদিও খিলাফত আন্দোলনের মূল হোতা ছিলেন স্বয়ং গাঁধিজী।

অন্যদিকে ১৮০৪ সালে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেকের দিল্লী অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত শাহওয়ালীওয়াল্লা পুত্র, শাহ আব্দুল আজিজ দেশ দার-ওল-হরর বা ইসলামের শত্রুর দেশ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেন। ফলে তার শিষ্য রায়বেরেলীর স্যার সৈয়দ আহমেদ ফের শুরু করেন তারিকা-ই-মুহম্মদীয়া নামক একটি আন্দোলন। এই আন্দোলনের একদিকে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ অন্যদিকে ভারতের ইসলাময়িতকরণ, হিন্দু ও বৌদ্ধদের শরিয়ৎ মনস্ক করার প্রচেষ্টা। এই সব নব্য মুসলমানরা ছিলো কলিমা উচ্চারণ করা নামমাত্র মুসলমান এবং যাবতীয় হিন্দু ও দেশজ সংস্কারে বিজড়িত। তরিকা আন্দোলন সাধারণভাবে ভারতীয় ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। ওয়াহাবি আন্দোলনের সুদূর প্রসারী প্রভাবে ভারতের নব্য মুসলমানরা ক্রমশ শরিয়ৎ মনস্ক হতে থাকে এবং তারা খুঁজতে থাকে নিজেদের শিকড়। এই শিকড় খোঁজায় প্রয়াসেই সিপাহী বিদ্রোহত্তর ভারতের মুসলমানরা একাত্মতা অনুভব করতে আরম্ভ করে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের ও ভারত বহির্ভূত মধ্যপ্রাচের ইসলামী দুনিয়ার সঙ্গে। যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক-এর মতে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যারাকপুরের মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহের জন্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু বেশীরভাগ ঐতিহাসিকগণ এর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। স্বদেশ বহিঃস্থ এইসব ইসলামী জাতির প্রতি প্রেমের উৎস অবশ্যই কোরান হাদিশ আদিষ্ট ইসলামী জাতীয়তাবোধ। এই বোধ স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়ত্ব বোধের বিপরীত। এই নিখিল ইসলামী বোধে তারা যে শুধু অটোমান সাম্রাজ্যের সমর্থক হলো তাই নয়, বাংলার মুসলমানরা চাঁদা তুলতে লাগল

দামস্কাস হেজাজ রেল লাইনের জন্য। আরব তুরস্ক অতীত গৌরব নিয়ে তারা রচনা করতে লাগল সাহিত্য। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উর্দু সাহিত্যে ইসলামের অতীত গৌরব নিয়ে যারা সাহিত্য রচনা করলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৌলানা শিবলী নোমানী, চিরাগ আলী ও মৌলভী জাকাউল্লা। বাঙলায় মৈজুদ্দিন আহম্মদ লিখলেন তুরস্কের ইতিহাস, শেখ আব্দুল জব্বার লিখলেন মক্কা মদিনার ইতিহাস।

বিশ্ব ইতিহাসের গৌরবময় অতীত নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন মুসলিম কবিরা ইসমাইল হুসেন সিরাজী লিখলেন ঃ-

কোথা সে ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন
কোথা সে স্পেনের মহিমা কেতন
কোথা সে আরবের প্রতাপ তপন
সকলি কি আজ ঘোর অন্ধকার!

ভারতীয় মুসলমানদের এমন মানসিক পরিবেশে ১৯১৪ সালে আরম্ভ হলো প্রথম মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে জার্মানী, ইতালী ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে যোগ দিলো অটোমান তুরস্ক, বিপক্ষে ইংরাজ ও ফ্রান্স। যুদ্ধে পরাজয় ঘটলো জার্মান পক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার সরিফ হোসেনের নেতৃত্বে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে গেলো মক্কা মদিনা। মক্কা মদিনা সহ আরব উপদ্বীপ জজিরাৎ-উল-আরব নামে খ্যাত। অভিযোগ উঠলো খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে জজিরাৎ-উল-আরব খলিফার হস্তচ্যুত হয়েছে। অভিযোগের ঢেউ ভারতের মুসলমান মানসেও এসে পৌঁছালো। কারণ মিল্লাতের ধারা সমস্ত মুসলিম মানসের মধ্যে পৌঁছালো, অভিঘাতে ভারতের কবি লিখলেন, 'ইসলাম আজ বিধর্মীর নখে এসে গেছে, তারা আজ অন্ধকারে ঢাকা।'

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্বচ্ছ যে খিলাফত আন্দোলন নিতান্তই ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলন। এর সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীদের কোনোও স্বার্থ জড়িত ছিল না, এই আন্দোলনকে সমর্থনের অর্থ ইসলামী জাতীয়তাবাদকেই সমর্থন।

গাঁধিজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম সমর্থনের আশায় এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপাষকতা সমর্থন করেছিলেন। তিনি তার পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন জুড়ে দিয়েছিলেন। পরে আলী ভাইদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। খিলাফত আন্দোলনের মূল চাবিকাঠি ছিলো আলী ব্রাদার্সের হাতে। তারা হলেন মোহাম্মদ আলী ও শৌকত আলী। এই মোহম্মদ আলীর নামে কলকাতায় মহম্মদ আলী পার্ক নামাঙ্কিত। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হলেন। এই বৈঠকে মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা এম. এ. আনসারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। ডাঃ আনসারীর এই দাবিকে সমর্থন করেছিলেন

কংগ্রেসী নেতা হাকিম আজমল খাঁ। ওই বৈঠকে গাঁধিজীকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছিলে। তখন থেকেই মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের একটা মেলবন্ধন ছিলো। ডাঃ হামিদ আনসারী ভারতের প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি কেরালায় কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তিনি অবসরের পূর্ব মুহূর্তে এক সংবাদ মাধ্যমের কাছে এক প্রতিবেদনে ভারতে সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত নয় এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত এবং ২০১৭ সালে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাকিস্তানী সহায়তায় আহমেদ প্যাটেলকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই ষড়যন্ত্রে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জড়িত। ইতিমধ্যে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (২০১৭) শ্রীমণি শঙ্কর আইয়ারের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক সংবাদাতা, পাকিস্তানে গিয়ে কার্যরত তিন ভারতের হাই কমিশনার এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এইচ. এস কাসুরি, ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল দীপক কাপুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ভোজ সভায় গুজরাট বিধান সভা নির্বাচনকে নিয়ে এক "রাষ্ট্রদ্রোহী" ষড়যন্ত্রের কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং আপত্তিজনক ভাষায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে, জাতির কাছে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা দাবি করেন। বাকযুদ্ধ চলতে থাকে। আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলী মহাশয় এক বিবৃতিতে দাবি করেন যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং ও শ্রী মণিশঙ্কর আয়ারের এই বাড়িতে এই ভোজ সভায় যাওয়া কূটনৈতিকতার বিচারে যাওয়া উচিত হয়নি। বিশেষত যখন পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে রয়েছেন। এও প্রকাশ যে পাকিস্তানের বর্তমানে সবচেয়ে জীবিত সন্ত্রাসবাদী হাফিজ সৈয়দের মুক্তির পরদিনই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং কাসুরির সহিত দেখা করলেন। এই বিষয়ে কথা বলতে হলে ভারতের বর্তমান শাসক দলের মুখপাত্র ডা জিভিএল নরসিংহ রাও এক বিদ্যুৎ মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে ভারতের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের উচিৎ, "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতবাসী যেন এক সুরে কথা বলে," কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যে পাকিস্তানের সহিত "সীমারেখা সন্ত্রাস" বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সহিত কোনও পর্যায়ে কূটনৈতিক আলোচনা করা উচিৎ নয়। আমরা যখন দেখি আমেরিকান বর্তমান রাষ্ট্রপতি যখন তাহার দেশের স্বার্থে কোনও "বিতর্কিত" আদেশনামা জারী করেন, তখন কিন্তু হিলারী ক্লিন্টন তার বিরোধিতা করে সংবাদ মাধ্যমের কাছে চলে যান। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দশ বৎসর দেশ শাসন করার পরও কথায় কথায় রাজনৈতিক ভাবে পাকিস্তানের সমর্থন করেন ভারতে মুসলিম ভোটের আশায়।

উপরের বিবরণ থেকে স্বচ্ছ খিলাফত আন্দোলন নিতান্তই এক ইসলামী মৌলবাদী আন্দোলন। এর সঙ্গে সাধারণ ভারতবাসীর কোনও স্বার্থ জড়িত ছিল না। মুসলমানরা কিন্তু

পৌত্তলিক হিন্দুদের সঙ্গে নয়। খৃষ্টানরা বিধ্বংসী হলেও সম্মানিত "কেতাবী" বিধর্ম্মী (অহল-ই-কেতাব)। তুলনায় হিন্দুরা ঘৃণ্য "মুসরিক" বিধর্ম্মী।

এইসব মুসলিম নেতারা হিন্দুদের সঙ্গে মেলানোর জন্য সমর্থন খুঁজতে লাগলেন কোরান হাদিশের মধ্যেই। যুক্ত আন্দোলনের সমর্থনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হজরত মহম্মদের মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে সাময়িক যুক্তফ্রন্ট গঠনের নজির উচ্চারণ করলেন। ডাঃ এম এ আনসারী (উনি এক সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন) কোরানের সুরা মুমতা হান্নার একটি বাক্য উৎকলিত করে বললেন, যেহেতু হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত নয় সেহেতু তাহাদের বন্ধুত্ব অকাম্য নয়।

খিলাফত আন্দোলনে ইসলামী প্রতীক ও বাগধারায় ব্যাপক ব্যবহার হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ব্যাপক বাধা সৃষ্টি করেছিল। দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাহীন ইসলামী পণ্ডিত (আলিম) ও ইমামরা শাহ আব্দুল আজীজের অনুশাসনে দেশকে দার-উল-হরর বলে ভাবতেন এবং উগ্র বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে তারা বৃটিশ বিরোধী খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাদের নেতা ছিলেন "ফিরিঙ্গি মহল" নামক ইসলামী পণ্ডিত সংস্থার মহম্মদ আব্দুল বারি, এই সব আলিমদের "মুস্তাফি কা ফতেয়া" সব মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলনে সামিল করেন। তাহারা অসহযোগ আন্দোলনকে "জিহাদ" বলে ঘোষণা করে এবং আন্দোলনের সমর্থনে তারস্বরে উদ্ধৃতি দিতে থাকেন কোরান শরীফ থেকে। কোরানের এই সব কথা খুবই উগ্র।

এখানে "Love Jihad" কথাটা খুব চালু আছে। এই জেহাদের পটভূমিকা হলো কেরল রাজ্য। বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের খবর হলো যে মুসলমান যুবকরা হিন্দু মেয়েদের প্রেম করে ভালোবেসে বিয়ে তারপর ধর্ম্মান্তরিত করা হয়। ইদানীং কেরালায় "হাদিয়া" নামে এক ফিজিওথেরাপীর ছাত্রী Shahin (সাহিন) নামে এক মুসলমান যুবকের দ্বারা ধর্ম্মান্তরিত হয়। কিন্তু NIA রিপোর্ট বলছে যে সাহিন একজন উগ্রপন্থী এবং তার সঙ্গে IS নামক উগ্র মুসলমানী সংগঠন যুক্ত। এই মামলাটা এখন সুপ্রীমকোর্টের বিচারাধীন। এর মধ্যে একটা মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও এসে গেছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষা হল যে কোনও ব্যক্তি যা শত্রুর সঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে অজান্তেই তাকে ভালোবেসে ফেলে। এটাকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় Stockholm Syndrome বলে। কারণ কোর্টে দাঁড়িয়ে হাদিয়া বলেছে সে সাহিনকে ভালোবেসে ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাই হাদিয়ার হিন্দু পিতা তার মেয়ের উপর অধিকার পায়নি। এখন হাদিয়া তার কলেজের ডীনের অভিভাকত্বের অধীনে হস্টেলে থেকে গিয়েছে। তার স্বামী তার সঙ্গে ডীনের উপস্থিতে দেখা করতে পারবে।

মুসলমানদের "ফতোয়া" যে কত কঠিন ও নিষ্ঠুর যে কলকাতা টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর মেরে হত্যার নিদান দিয়েছিলেন।

১৯২০ ডিসেম্বরে এলাহাবাদ কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যুক্ত হসরৎ মোহনী ঘোষণা করলেন "আফগান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে মুসলমান তাতে যোগ দেবে। মৌলানা মহম্মদ আলী অন্যত্রও একই বক্তব্য রাখলেন। গাঁধীজি এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন।

অনাবিল ইসলামের বাগধারায় এই ধরনের প্রয়োগের ঘোষণা কোরান-হাদিশ পড়া হিন্দু নেতাদের স্বাভাবিকভাবেই ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললো। কারণ আগেই বলা হয়েছে ইসলামী তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দুরা অতি ঘৃণ্য বিধর্ম্মী। তাহারা পৌত্তলিকায় বিশ্বাসী, তাই তাহারা মুসলমানের চোখে "কাফের" নামে পরিচিত। আর মুসলমানরা হিন্দুদের চোখে "যবন" নামে আখ্যায়িত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দ মঠ" উপন্যাসে এর হুবহু বর্ণনা আছে। এই উপন্যাসে বঙ্কিম প্রথম কোন পুস্তকে এই দেশপ্রেমের গানটি ব্যবহার করেছিলেন।

হিন্দু নেতাদের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ালো। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় মালাবারের মোপলা মুসলমানরা প্রাথমিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক পুলিশকেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করলেও শেষ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে হিন্দুদের উপরেই তাদের আক্রমণ হানলো। দাঙ্গায় নিহত হলো ছশো জন হিন্দু। বলপূর্বক ইসলামায়িত করা হলো প্রায় আড়াই হাজার জনকে।

একচক্ষু হরিণের মতো পণ্ডিত নেহেরু জওহরলাল মোপলা জিহাদকে বিদ্রোহ বলে মানতে চাননি, ঘটনাটাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে একটা মামুলি বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা ঠিক বৃটিশ সরকার কড়া হাতে এই মধ্যযুগীয় বর্বরতার মোকাবিলা করে। জওহরলালের মনে এই হিন্দু গণহত্যা ও গণ ধর্মান্তরকরণ কোনও রেখাপাত করেনি। তাহার আত্মজীবনীতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এরপর অন্ধকূপ হত্যার জন্য (এখানে বলে রাখা ভালো যে ইংরাজ-সিরাজদৌল্লার যুদ্ধে কিছু ইংরাজ সৈনিককে নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতায় বন্দী করে রেখেছিলেন এবং কেউ কেউ তাতে মারা গিয়েছিল, ইংরেজরা বর্ণনা করলো যে সিরাজ গোরা সৈন্যদের আলো বাতাসহীন একটা অন্ধ কুঠরীতে রেখেছিলেন। এবং তাদের স্মরণে লালদিঘীতে হলওয়েল মনুমেন্ট তৈরি করেছিলেন। কিন্তু পরে অনুসন্ধান করে এটা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় নেতাজী সুভাষ বোসের আন্দোলনের ফলে এই স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হল। নেহরুজী চিরকালই মুসলমান তোষণকারী নেতা ছিলেন। এই ঘটনার পাশাপাশি উল্লেখের দাবি রাখে ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতার বুকে মহম্মদ আলী জিন্না এবং মুসলীম লীগের ডাকে যে কলকাতায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল তাতে বেশ কয়েক হাজার হিন্দু নিধন হয়েছিলো। ওই দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ মদত দিয়েছিলেন কলকাতাবাসী অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী রক্তপিপাসু সোহরাবর্দী। এই দাঙ্গার পরে সোহরাবর্দী গান্ধিজীর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

হিন্দু নিধন দাঙ্গার পটভূমিকা ঃ- ১৯৪৬ কলকাতার 'Great Calcutta Killings' সময় হিন্দু অধ্যুষিতরা দাঙ্গার শিকার হয়েছিলেন, এবং তাদের বেশীরভাগই বিহার হতে আগত শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেশী ছিলো। এর বদলা হিসাবে বিহারে ১৯৪৬ সেপ্টেম্বর অক্টোবরে বিহারে জাতিদাঙ্গা হলো। তখন নেহেরুজী অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী হিসাবে বিহার সফরে গিয়েছিলেন। যেহেতু তাহার ব্যক্তিসত্তা হিসেবে একটু বেশী মাত্রায় অধৈর্য ছিলেন। তাই বিহারে গিয়ে তিনি জনসভায় জনতাকে ভয় দেখিয়ে ছিলেন যে যদি দাঙ্গা তাড়াতাড়ি না থামে তিনি জনতার উপর বোমা বর্ষণ করার হুকুম দেবেন। কিন্তু জনশ্রুতি এই যে কোন কোন জায়গায় নেহেরুর আদেশে বোমা বর্ষণ হয়েছিলো এবং তাতে প্রায় ৪০০ জন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ গিয়েছিল। এই রকম আরও কিছু চমকপ্রদ খবর পাওয়া যায়। কথিত আছে নেহেরু তাহার "বান্ধবী" শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুকে চিঠি লিখেন যে তাহার আদেশে ৪০০ লোকের মৃত্যু হয়েছিলো। তিনি রসিকতার ছলে স্বীকার করেন যে এই রকম তাহাকে আনন্দ দেয় না। তিনি পদ্মজাকে বলেন জনতার উপর 'নির্বচারে গুলি করে হত্যা করা তাঁর মানসিকতায় নাই।

কিন্তু ভারতের নাগরিকদের নেহেরুর কাছ থেকে বন্দুকের নল উচিয়ে (Trigger happy) দেওয়ার প্রবণতা ছিলো। আমরা নেহেরুর ব্যক্তিসত্তা যত অনুধাবন করবো দেখব নেহেরু একটু কঠোর ভাবধারায় লালিত পালিত হয়েছিলেন। তিনি বিত্তবান বাবার "আদুরে দুলাল" (Spoiled Child) ছিলেন।

১৯২১ এবং ১৯২২ ঃ- এই দুটো উপর্যোপরি বৎসর গান্ধীজির জীবনে কালে মেঘ এনে দেয়। গান্ধীজির রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে উপর্যুপরি বৎসরে দ্বিধাবিভক্ত ব্যর্থতার গ্লানি তাকে সহ্য করতে হয়েছিলো। বৃটিশ শাসকরা কিন্তু সুচুতরভাবে খিলাফত আন্দোলনকে বিভক্ত করলেন। এজন্য তাদের কোনও 'প্রত্যক্ষ আক্রমণ' (Surgical Strike) করতে হয়নি। ইংরাজরা তাদের চিরাচরিত 'ভাগ করা ও শাসন করা' নীতি অবলম্বন করলেন। এই সময় বৃটিশরা হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা আলাদা ভোটাধিকার অধিকারের জন্য আলাদা আলাদা নির্বাচনী ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। এতে হিন্দু মুসলমান বিভাজন হয় এবং বৃটিশরা মণ্ডল কমিশন বসিয়ে উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্গের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ঃ- ১৯২২ সালে তিনি প্রশাসনিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে এই আন্দোলন অহিংস হবে। কিন্তু ১৯২২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি গোরখপুরের (উঃপ্রদেশের) চৌরিচৌরায় ২২জন নিরপরাধ পুলিশকে পিটিয়ে মারলো, ওখানকার প্রান্তিক এলাকায় ধারণা ছিলো ওখানে সক্রিয় বৃটিশ বিরোধিতা হবে। অতএব চৌরিচৌরার পর অসহযোগ আন্দোলন অচিরেই জন্মানোর আগেই শিশুর অপমৃত্যু হলো।

এর মধ্যে তিন তিনটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হলে এই তিনিটি দল হল-

(১) মুসলিম লীগ ঃ- লীগের জন্ম ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমোল্লার নেতৃত্বে নতুন দলের জন্ম হলো। অতএব যখন কলকাতা ভারতের রাজধানী, তখন সমস্ত বঙ্গদেশে রাজনৈতিকতা ক্রমশ জমে উঠেছে। এখানে মনে রাখতে হবে ১৯০৫ বৃটিশরা বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করতে উদ্যাগী করেন বাংলার দামাল ছেলেরা বিনয় বাদল দীনেশের নেতৃত্বে মহাকরণে অলিন্দযুদ্ধের মাধ্যমে বৃটিশ রাজপুরুষদের উপর আক্রমণ হানতে লাগল। তাই এবার বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা করলেন। তখন লর্ড কার্জন উগ্রপন্থীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজকে ভাগলপুরে স্থানান্তর করার কথা ভাবছিলেন। তখনই কবিগুরুর নেতৃত্বে রাখী বন্ধন প্রথা চালু হলো। তখন বিদেশী দ্রব্য বর্জন আরম্ভ হলো। তখনই পূর্ববঙ্গের চারণ কবি মুকুন্দদাসের স্বদেশী নাটক শুরু হলো। তখনই বাংলায় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী ও কানাইলাল দত্তরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিলেন। যখন ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসিতে গেলেন, তখন তাঁর মাত্র ১৬ বৎসর বয়স। আজকের নিয়ম অনুযায়ী তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক বিভাগে বিচার হওয়া উচিৎ ছিলো। তাহলে বোধ হয় তাঁর ফাঁসি হতো না।

এবার ভারতে প্রগতিশীল দলের জন্ম ঃ- লিবারেল পার্টি অব ইন্ডিয়া, বেশীর ভাগ নেতাই উচ্চ পদাধিকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় বৃটিশরা ভারতীয়দের আরও বেশী করে ক্ষমতা দেওয়া যায় কিনা সে সময়-চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। ১৯৩০ দশকে বৃটিশরা দুটো গোল টেবিল বৈঠক লন্ডনে ডাকে। ওই বৈঠকে ভারতের সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতাদেরও ডাকা হয়। গাঁধিজী ও বি. আর. আম্বেদকার লণ্ডনে উক্ত দুটো গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। কিছু নেতার ধারণা হলো যে বেশী কঠোর আন্দোলন করেই স্বাধীনতা লাভ হবে। তখনই ভারতে লিবারেল পার্টির জন্ম হয়।

প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন বাংলাযর নেতা শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁহার সতীর্থরা হলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, এস. আর জয়াকারে, সি. ওয়াই চিন্তামণি, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন. সি কেলকার। বৃটেনের শেষ লিবারেল পার্টির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর ভারতে লিবারেল পার্টি অব ইণ্ডিয়ার অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দেয়। তাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লিবারেল পার্টি অব ইন্ডিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো। লিবারেল পার্টি অব ইন্ডিয়ার ৫০ বৎসরের সময় এই পার্টির কাজকর্ম পর্যালোচনা করে এক থিসিস জমা দেন ১৯৮৬ সালে কলকাতর অধ্যাপিকা হাসি ব্যানার্জী।

জমিয়াত-উলেমা হিন্দ নামক রাজনৈতিক দলের জন্ম ঃ- যখন খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় তখন খিলাফতীষ্টদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যায়। এই দলে তখন কট্টরপন্থী ও নরমপন্থী দুটো ভাগ হয়ে যায়। আব্দুর বারী ও সফির আলির নেতৃত্বে এই কট্টরপন্থী দলের জন্ম হয়। কিন্তু যাঁরা নরমপন্থী তাঁরা আলিম ও ইমামদের দ্বারা পরিচালিত হলেন। অবশ্য এখনও পশ্চিমবঙ্গে জামিয়াৎ-উলেমা হিন্দু মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রিসভার সদস্য

সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি। বাংলাদেশে জমিয়াৎ উলেমা এখন সমস্ত রকম উগ্রপন্থীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় উগ্রপন্থী কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গের এবং National Investicative Agency-এর জন্য JMB সদস্যের খোঁজ করছে। তখন পর্যন্ত নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে খিলাফৎ তথা অসহযোগ আন্দোলন এবং বৃটিশ কূটনৈতিক চক্রে খিলাফতীদের বিভক্ত করতে সমর্থ হয়। সত্যিকারে ভারতীয়দের সঙ্গে খিলাফতীদের কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল না। মুসলমানদের ধারণা ছিলো যে 'খলিফাপ্রথার দ্বারা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও ভারত মহাদেশকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অনেকটা ভ্যাটিকান দ্বারা সমস্ত খৃষ্টান জগতকে শাসন করার মতো। এখন যেমন অযোধ্যা রাম জন্মভূমি দখল করে সমস্ত উত্তর ভারত হাতে থাকবে। রামজন্মভূমি জায়গা তো মাত্র ৯বিঘা (সর্বসাকুল্যে ৩ একর জমি) এবং বিষয়টা সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন। এই মামলায় সুন্নী বোর্ডের অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বাল এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

যাক পুরোনো কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম নেতা মুহম্মদ সফি বড় লাট লর্ড রিডিংকে বলেন বৃটিশরা ইস্তানবুল ত্যাগ করলে এবং স্মানা ও থ্রেশ অঞ্চল তুরস্ককে ফিরিয়ে দিলে এবং পবিত্র তীর্থগুলো খলিফার হাতে ফিরিয়ে দিলে তারা মুসলমানদের অসহযোগ আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। লর্ড রিডিং-এর কূটনীতি অনুযায়ী ভারত সচিব তার বার্তা জনসমক্ষে প্রকাশ করারও অনুমতি আদায় করে নেন। রিডিং-এর কূটনীতি অনুযায়ী ভারত সচিব তার বার্তা প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রচণ্ড সমালোচনা হয় এবং পরিণামে ভারত সচিব লর্ড মন্টেগুকে পদত্যাগ করতে হয়। এই সব ঘটনার ফলে লর্ড রিডিং মুসলমানদের কাছে নিজের আন্তরিকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হন। মহম্মদ আব্দুল বারি, হসরৎ মোহনী, রিডিং ও মন্টেগুর প্রচেষ্টায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং খিলাফত আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন

চৌরিচৌরা আন্দোলনের জের ঃ- যখন ১৯১২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি ২২জন পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলে গাঁধিজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করার আদেশ দিলেন। এর ফলে উগ্র খিলাফতী, যারা মুহম্মদ সাফি বারিদের কথায় কর্ণপাত করেনি তারাও এর ফলে গাঁধিজীর প্রতি আস্থা হারায় ও মুসলীম মৌলবাদে ফিরে যায় এবং জামিয়াৎ উল-উলেমা তবলিগ বা ইসলামায়ন আন্দোলনে যুক্ত হন, সেটা হয় ১৯১৯ সালে।

অন্যদিকে মোপালা জিহাদের দ্বারা ত্রস্ত মালব্য, লাজপত, শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দু নেতারা "সংগঠন" "শুদ্ধি"প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলিম জাগরণের সমান্তরালে হিন্দুশক্তি জাগ্রত করতে সমর্থ হন। (এখানে মালব্য হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, লাজপত হলেন পাঞ্জাবের নেতা লালা-লাজপত রায় ও শ্রদ্ধানন্দ হলেন যার নামে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক এবং কলিকাতার রাজপথে উগ্রবাদীদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি আর্য সমাজীনেতা ছিলেন।)

ফলে সাম্প্রদায়িক বিষ বাষ্পে জর্জরিত হয়ে ভারতের সামাজিক পরিমন্ডল বিষ বাষ্পে জর্জরিত হয়। ১৯২৪ সালে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক পাশা খলিফাদের অবলুপ্তি ঘটানোয় খিলাফত আন্দোলনের চিরতরে অবসান ঘটে। এর ফলে এক চরম হতাশা নেমে আসে মুসলিম জনমানসে। হতাশা থেকে ক্রমে ক্রোধের লক্ষ্যই হলো ঘরের শত্রু। ফলে দাঙ্গায় জর্জরিত হতে থাকে সমগ্র ভারতের মোপালা জিহাদের পর থেকে ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ১১২টি হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়। এর ফলে ৪৫০টি জীবন নষ্ট হয়। এইসব দাঙ্গার উৎসমূল অবশ্যই খিলাফৎ আন্দোলন - যে আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ শরিক ছিলেন আমাদের আলোচ্য জওহরলাল।

মুসলিম ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে বারবার প্রতিক্রিয়াশীল বললেও অত্যন্ত বিপজ্জনক মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে জওহরলালের সখ্যতার পর্ব এখানেই শেষ নয়। ১৯৩৪ সালের ভারত শাসন আইনবলে (Defence of India Rules) ১৯৩৭ সালে বৃটিশ ভারতে যে নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে (প্রদেশে) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও দেখা যায় সংক্ষরিত মুসলিম আসনগুলিতে কংগ্রেসের সাফল্য নগণ্য। ফলে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে জওহরলালের নেতৃত্বে একটি মুসলিম জনসংযোগের কমিটি গঠন করে। এই আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস তার মুসলিম সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। বেশ কিছু বামপন্থী মুসলিম ও কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেয় বেশ কিছু মৌলবাদী-মুসলিম সংগঠনও। যেমন জামিয়াৎ উলেমা হিন্দ, অল ইন্ডিয়া অহল-এ -হাদিস লীগ (ঊনবিংশ শতাব্দীর তারিকা মহম্মদিয়া আন্দোলনের ভগ্নাংশ) এবং শিয়া পলিটিক্যাল কনফারেন্স)। এদের প্রত্যেকের কংগ্রেসে যোগদানের কারণ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। শিয়াদের কংগ্রেসে যোগদানের কারণ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগ মূলতঃ একটি সুন্নী সংগঠন। যদিও এর প্রধান নেতা জিন্না ছিলেন একজন শিয়া। অহল-এ-হাদিসও জামিয়াৎ এর লক্ষ্য সমগ্র উপমহাদেশের পূর্ণ ইসলামীয়ান। মুসলীম বিচ্ছিন্নতাবাদীর মঞ্চের চেয়ে জওহরলালের কংগ্রেসী মঞ্চ সেই উদ্দেশ্য সাধনের বেশী সহায়ক, বামপন্থী মুসলিমদের কংগ্রেসে যোগদানের কারণ তাহাদের মানসিক গঠনের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালের নামজাদা মুহাম্মদ কানওয়ার আশ্রফ ও খাজা আহমদ আব্বাস উচ্চ শিক্ষিত, সৃষ্টিশীল ও যুগচেতনা অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। যাহা মুসলিম সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের পরিপন্থী। মুসলিমদের সুন্নী আন্দোলনের লক্ষ্য কোরান-হাদিস আদিষ্ট সঙ্ঘ জীবন। সুতরাং সৃষ্টিশীল জীবনের বিকাশের সপক্ষে কংগ্রেসী সমাজজীবন অধিকতর বেশী সুবিধাজনক। এইভাবে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণে বামপন্থী সমেত মৌলবাদীরা কংগ্রেসের পতাকা তলে সম্মিলিত হয়েছিলো। কোনো স্বাদেশীকতার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। এই কংগ্রেস যোগদানকে মুসলিম মানসে যুক্তিগ্রাহ্য

করার জন্য জামিয়াৎ নেতা হুসেন আলী মাদানী-'কত্তম" বা জাতির সংজ্ঞা হিসেবে বললেন-কত্তম বলতে শুধু মুসলিম জাতি বোঝায় না। অন্য শব্দ হচ্ছে মিল্লত, কত্তম বাসভূমি ভিত্তিক জাতি। তিনি এই ব্যাপারে মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে বাকযুদ্ধেও জড়িয়ে পড়লেন।

জওহরলাল হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগের বিরোধিতা করলেও এইসব নানারঙের মুসলিম মৌলবাদীরা কংগ্রেসে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি খুশীই হলেন। এর ফলে (Congress always in favour of "Rainbow" Coalition)। কংগ্রেসে এই ধারা আজও অব্যাহত। সোনিয়া গাঁধির কংগ্রেস তাহার ১৯ বৎসর সভাপতিত্বে কংগ্রেস কেরালায় ইন্ডিয়ান মুসলিম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ভাবতে অবাক লাগে গত উনিশ বৎসর ইতালীর জন্মসূত্রে শ্রীমতী সোনিয়া মাইনো কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। কোন জন্মসূত্রে ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে ছাড়া এই পদে কাউকে পেলেন না। কতিপয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে যেহেতু জাতীয় কংগ্রেসের 'মুঠি' নেহেরু পরিবারের হাতেই থাকবে তাই গত তিন দশকে মোট চারজন বড় মাপের কংগ্রেস নেতা কংগ্রেস ছেড়েছেন। তাঁরা হলেন শ্রীনারায়ণ দত্ত তেওয়ারী-তিনি দু'বার উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হলেন শ্রী শারদ পাওয়ার, তিনি তাহার পার্টির সহিত কংগ্রেসের সহযোগীতায় মহারাষ্ট্রেও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। পরে তার নিজের দল গড়লেন। তৃতীয় জন হলেন শ্রীজিকে মুপানর। তিনি তামিলনাড়ুর কংগ্রেসের নেতা ছিলেন। চতুর্থ জন হলেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী। তিনিও ভেবে নিলেন যে কোন দিনই জাতীয় কংগ্রেসের সর্ব্বোচ্চ পদে যেতে পারবেন না। মমতা ব্যনার্জী ছুতো দেখালেন যে পশ্চিম বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সি.পি.এমের 'বি' টীম। মোটেই এই যুক্তি ধোপে টেঁকে না। তারা জাতীয় কংগ্রেস পর পর (মাঝখানের কিছু সময় বাদে) প্রায় ছ-জন নেহেরু পরিবার থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ আঁকড়ে থেকেছেন। তারা হলেন মতিলাল তার পুত্র জহরলাল তৎ কন্যা ইন্দিরা গাঁধি, রাজীব-সনিয়া এবং সর্বশেষ রাহুল গান্ধী। তাদের নির্ব্বাচনী ক্ষেত্র রায়বেরিলী ও আমেথি-প্রায় বাঁধা ধরা তালুকের ক্ষেত্র তাদের নির্ব্বাচনী ক্ষেত্র। এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভালো জওহরলালের নির্ব্বাচনী ক্ষেত্র ছিল উত্তর প্রদেশের ফুলপুর নির্ব্বাচনী ক্ষেত্র। স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় ১৯৫২ জওরলাল যখন ফুলপুর থেকে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং নেহেরুর বিরুদ্ধে ১ লক্ষ ভোট পড়েছিল, এতে সমস্ত ভারতবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিলো। নেহেরুর বিরুদ্ধে এক লক্ষ ভোট পড়বে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। ইদানীংকালের মিউনিসিপাল নির্ব্বাচনে আমেঠি থেকে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হয়েছে। যদিও আমেঠিতে AIMS এর অনুকরনে একটি মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার কথা এবং ১৯ বৎসর আগে তা অনুমোদিত হয়েছে কিন্তু নানা কারণে তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তাই প্রায় ২ মাস আগে যখন NTPC-র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ভীষণ অগ্নিকান্ড হলো তখন রোগীদের ৪০০ মাইল দূরে

লক্ষ্ণৌ হেলিকপ্টারে নিয়ে যেতে হয়েছিলো। আমরা যদি বিগত ২০ বৎসরের কথা বিচার করি তবে দেখবো যে রাজীব গাঁধির মৃত্যুর পর সোনিয়া কিংবা রাহুল কোনও প্রশাসনিক পদ গ্রহণ করেনি। কিন্তু এই দুই জন সর্ব্ব ঘটে "ক্যাটালি কলা"। সোনিয়ার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা একমাত্র রাজীব গাঁধি মেমোরিয়েল ট্রাষ্ট্রের ১০১ কোটি ফান্ডের এই টাকা মনমোহন সিং অর্থ মন্ত্রী থাকাকালীন একটা পাবলিক ট্রাস্টকে মঞ্জুর করেছিলেন এবং এইটা আইন বিরুদ্ধ। সে কথা বলতে গেলে নেহেরু সম্পর্কে বলতে তখনকার মুসলিম মৌলবাদীদের কথা অবশ্যই চলে আসবে। তাদের নেতা ছিলেন মাওলানা আবু আলা মাওদুদি এবং এর দুই প্রধান সহযোগী ছিলেন আশ্রফ আলি থানভি ও সব্বির আমেদ উসমানী। নেহেরুর নেতৃত্বে জন সংযোগ আন্দোলনে সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন বেরেলবী আলিম সংস্থা ও ফিরিঙ্গি মহল আলিম সংস্থা। মাওদুদির মতে ইসলাম ধর্ম্ম মানুষের জীবনকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করে। সুতরাং কংগ্রেসী সেকুলারবাদ ইসলাম বিরোধী। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর যে ভারতের সংবিধান গৃহীত হয় তাতে সংবিধানে সেকুলারবাদ নিয়ে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। ভারতীয় সংবিধানে এইটা গৃহীত হয় ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গাঁধির সংবিধান সংশোধনের মারফৎ। অতএব প্রশ্ন উঠে যে সেকুলারবাদ বাস্তবে সম্ভব কিনা কিংবা এইটা একটা 'সোনার পাথর বাটি'। অন্যদিকে মুসলিম জনসংযোগ আন্দোলনের কোনও ভিত্তি ছিলো না, তাই এটা নিম্নবর্গের মুসলমানদের স্পর্শ করতে পারলো না। উপরন্তু উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যে কংগ্রেস থাকার ফলে বহু মুসলমানদের কাছে এইটা একটা সরকারী রূপ পরিগ্রহণ করলো। সরকার দ্বারা জোর করে মুসলমানদের কংগ্রেসের পতাকা তলে আনার প্রচেষ্টা অনেকে ভালোভাবে নিলো না। মুসলীম লীগ কংগ্রেসী রাজ্যে মুসলমানদের প্রতি অত্যচারের তদন্ত করে "পীরপুর কমিটি" রিপোর্ট প্রকাশ করলো। শেষ পর্যন্ত জনসংযোগ আন্দোলন পরিত্যক্ত হলো। ফলে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী প্রচেষ্টার "আগে ভারতীয় পরে মুসলমান"- অতএব জিন্নার কথা মত আগে মুসলমান পরে ভারতীয় "বামফ্রন্টরা এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করল। এটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও দেখা যায়। আমাদের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী-শ্রীজ্যোতি বসু বলতেন-আগে কমুনিষ্ট পরে মুসলমান। কিন্তু তাহার মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুল রেজ্জাক বলতেন "আগে মুসলমান পরে কমুনিষ্ট" আমরাও ভাবি যে কমুনিস্ট ও মুসলিম ধর্ম্ম একসঙ্গে চলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের অন্য আরও এক কমুনিষ্ট নেতা এই সুরে কথা বলতেন, যেমন প্রয়াত মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্ত্তী নিজেকে কমুনিষ্ট বলতেন আবার তারা পীঠে মানত করতেন।

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু স্পষ্ট করে বলা যায় যে জওহরলালের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। জিন্নার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিনি ইসলামী মৌলবাদের সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। তার ফলে দেশে সর্ব্বনাশ ডেকে আনা

হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে একই বন্ধনীতে ফেলা যায়। সম্প্রতি পঃবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যেহেতু পঃ বঙ্গের ৩১ শতাংশ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তাই তিনি চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি কি বাকী ৬৯ শতাংশের মুখ্যমন্ত্রী নন তাই পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুধু মুসলমানের সন্তুষ্টীর জন্য ইমাম ভাতা চালু করলেন। প্রতি জিলায় হজ হাউস প্রতিষ্ঠা করলেন। যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত জায়গায় 'বিষ' মদে অনেক লোক মারা গেলেন তাই তাদের জন্য ২ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করলেন। নেহেরুজী মুখে যত সেকুলার কথা উচ্চারণ করুন না কেন, তার মানসিক কাঠামো ছিলো হিন্দু বিরোধী এবং মুসলমানদের প্রতি নমনীয়। তার উচ্চারিত সেকুলারবাদ আসলে এক তোষণবাদী।

জওহরলাল কথা বলতে এবং লিখতে ভালোবাসতেন। চিঠি লিখেছেন, আর লিখেছেন আত্মজীবনী, ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া, লিখেছেন "Father's Letter to his daughter" যখন স্ত্রী কমলা নেহেরু যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত (স্ত্রী তখন সেনাটরিয়ামে ভর্ত্তি এবং কন্যা ইন্দিরা দূরে ডাঞ্জাবাসে ভর্ত্তি, তখন কন্যাকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে চিঠি লিখতেন। যখন কমলা নেহেরু বিদেশে চিকিৎসাধীন, তখন কবিগুরু তাহার বন্দীমুক্ত হওয়ার জন্য ভাইসরয়কে চিঠি লিখেছিলেন।

কিন্তু একটা কথা বলতেই হবে যে নেহেরুজী বেশী কথা বলা অভ্যাসের জন্য একটু বেফাঁস কথা বলতেন। অগাথা ক্রিষ্টি লিখেছেন "মানুষকে বেশী কথা বলাও"। ঠিক কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলবে। চৈনিক পন্ডিত কনফুসিয়াস বলতেন- "কম কথা বলবে", প্রয়োজন না হলে কখনও না। জওহরলাল জীবনে বহু বেফাঁস কথা বলেছেন। তার লেখার মধ্যেও আছে বহু পরস্পর বিরোধী কথা, একবার স্বাধীনতার একটা আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলি চালানোর পরে ছয়জন মানুষের মৃত্যু হয়। তাই এই ঘটনার পরে বিশিষ্ট জননায়ক শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিবাদ করলে নেহেরুজী বলেন যে উক্ত আন্দোলনে জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে। তাই নেহেরুজী ওই গুলিচালনায় যৌক্তিকতা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তার উত্তরে জয়প্রকাশ বলেন যে "জাতীয় পতাকার সম্মান, শুধু একটুকরো কাপড়ের জন্য নয়"। অনেকে বলেন নেহেরুজী মোটেই সংবেদনশীল ছিলেন না। তিনি কিছুটা উদ্ধত প্রকৃতির এবং বাক বিতন্ডার সময় অধৈর্য্য হয়ে পড়তেন।

নেহেরুজীর লেখার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কথা। ভারতীয়রা একটা জাতি, না বহুজাতি সেটাই তিনি ঠিক করতে পারেন না। পরে নিজেই লজ্জা পেয়েছেন তার নিজের লেখার জন্য। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে ভারত একটা বহুমাত্রিক জাতি (Pluralistic Society) এখানে ১২১টা ভাষায় কথা বলে। বহু জাতি ও বহু ধর্মের সমন্বয়ে এই দেশ গঠিত, ভারতে সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার উচ্চারিত সেকুলারবাদের কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীতে উনবিংশ শতাব্দীতে

সংস্কার/পুনর্জীবন আন্দোলনের উদ্ভব হয়। আমাদের এই ব্যাপারে মনে রাখতে হবে Renaissance -র জন্য শিকাগো বিশ্বধর্ম্ম সভায় স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত শিক্ষা ও ভাব ধারণার কথা এই প্রচারক তার পরবর্ত্তী চার বছর ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক বক্তৃতা করেন ও তারপর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা বহু বৎসরকালীন মুসলিম আইনের বেড়াজালে নিপীড়িত হিন্দু বা সমদর্শী বৃটিশ আইনের সুযোগে পূর্বতন যাবতীয় ক্ষোভের প্রশমনে এগিয়ে আসে।

মুসলমানদের তরিকা আন্দোলনের সুদূর প্রসারীর ফলে নব্য মুসলমানরা ব্যাপকভাবে শরিয়ৎ মনস্ক হয়ে উঠল তারা মাদ্রাসায় শুধু কোরান শরীফ পাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক জওহরলাল ১৯৬৪ পর্য্যন্ত ভারতে রাজত্ব করেছেন। সেই আমলে তিনি হলেন ভারত, ভারত বলতে জওহরলাল নেহেরু। সুতরাং ভাবনা চিন্তার নিরিখেই রচিত হতো ইতিহাস, বলা হত সে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস পুরোপুরি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। এই সময় ইতিহাস সংক্রান্ত বুদ্ধিজীবীরা যথা ইরফান হাবিব, রমিলা থাপার, বিপানচন্দ্র ও শুশোভন সরকার এই সমস্ত বামপন্থীরা ছিলেন কংগ্রেসী আমলে দিল্লী শাসনের "বিচার কেন্দ্র" (Think Tank)। এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ইতিহাস বই প্রকাশনে, সিলেবাস নির্ব্বাচনে এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের অদৃশ্য হস্ত দেখা যেতো। এই অদৃশ্য হস্ত দিল্লীর উচ্চবর্ণের বিশ্ববিদ্যালয় (Elite University) ছাত্র সভায় নির্ব্বাচনের সময় তার অদৃশ্য ছাপ পাওয়া যায়। ২০১৭ সালে নতুন এক উৎপাৎ শুরু হয়েছে দিল্লীর জে.. এন. ইউতে নতুন উৎপাত শুরু হয়েছে তার নাম হয়েছে -Azadi League-এর এই লীগের বক্তব্য হচ্ছে যে তাহারা ভারত রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে না। তাহারা যে সমস্ত দেশীয় উগ্রপন্থী (আফজল গুরু প্রমূখ) তাহারা ভারতের পার্লামেন্টের সমস্ত ভারতীয় নেতাদের নাকা বন্দী করেছিলো, তাদেরকে শহীদ বানাবার চেষ্টা করেছিল। এই ব্যাপারে আমাদের তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। তখন অবিভক্ত কমুনিষ্ট পার্টি মিছিলে আমাদেরকে বলতে হতো "এ আজাদী ঝুটা হায় ভুলো মাৎ"। এই আজাদী লীগের দুইজন প্রধান ছাত্রনেতা হলো (Kanaiha Kumar) কলকাতা কিছু সাংবাদিক যথা ইংরাজী-স্টেটস্‌মেন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীসুনন্দ দত্তরায় প্রমূখ তো কানাইয়া কুমারকে প্রায় মহাত্মা গাঁধির পর্য্যায় ফেলে দিয়েছেন। আমাদের দেশে সংবাদ মাধ্যমতো নতুন পতিদার নেতা হার্দিক প্যাটেলকে প্রায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পর্য্যায়ে ফেলে দিয়েছেন। হার্দিক প্যাটেলের একটা কৃতিত্ব হচ্ছে যে তিনি পতিদারদের একটা সংরক্ষণ কোটায় ফেলে দেবেন। পতিদারদের (প্যাটেল সম্প্রদায়ভুক্তদের) নিজের বুদ্ধির জোরে কেন চাকরি পেতে পারেন না। ভারতের অর্থমন্ত্রী বলেছেন- যে পতিদারদের নতুন কোনও কোটায় ফেলা অসম্ভব (কারণ গুজরাটে এখন ৫০% কোটাভুক্ত হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)

ভারত এক বৃহৎ দেশ, তার নানা প্রান্তে নতুন নতুন সমস্যা তৈরী হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীর এক নিশ্বাসে উচ্চরণ করা গেলেও রাজ্যের ভৌগোলিক চরিত্র ও জনচরিত্র বৈচিত্রময়। জম্মু হিন্দু প্রধান, লাডাখ বৌদ্ধ প্রধান, বালতিস্থান মুসলমান প্রধান হলেও ভাষা বালতি। মুজাফরাবাদ-মীরপুর অঞ্চল মুসলমান প্রধান হলেও পাঞ্জাবী প্রধান। পাঞ্জাবী ভাষী পর্ব্বত বেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকা মুসলমান কিন্তু উর্দূভাষী। কাশ্মীরই একমাত্র ভারতীয় রাজ্য যেখানে উর্দূতে সরকারী কাজকর্ম্ম হয়।

ভারতে স্বাধীনতার পরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিশ্বাসী জম্মুর মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিলো জম্মু সম্পূর্ণভাবে ভারত অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন- জওহরলাল উচ্চরিত গণভোটের ফলে গোটা রাজ্য পাকিস্তান ভুক্ত হওয়া সুনিশ্চিত। কারণ মুসলমানরা মিল্লাতে বিশ্বাসী। সেক্ষেত্রে গণভোটের পরে জম্মুবাসীর অবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা অথবা খুলনা জেলার হিন্দুদের মতো। এখানে বলে রাখা ভালো Radcliffe-এর রোয়েদাদের ফলে প্রাথমিক ভাবে খুলনা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয় পরে পাকিস্তানে যায়।

স্বাধীন হওয়ার সময় খুলনা জিলার হিন্দুরা ছিলো সংখ্যা গরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট খুলনাতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলেও দুদিন পরে সংবাদ আসে খুলনা জেলা সংলগ্ন যশোরের মতো পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে। ফলে খুলনা জেলায় হিন্দুরা ব্যাপকভাবে ভারতের উদ্বাস্তু হয়। এখানে একটা বিচিত্র কথায় কথা বলা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা প্রথমে পাকিস্তানভুক্ত হয় কিন্তু পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের ব্যক্তিগত দৌত্যে মুর্শিদাবাদ পরে ভারতভুক্তি। তাই মুর্শিদাবাদের স্বাধীনতা উদযাপন ২ দিন পরে হয় অর্থাৎ খুলনার উল্টোটা মুর্শিদাবাদে হয়। এবার শ্রীজওহরলাল নেহেরু সম্বন্ধে আবার আসা যাক্। জওহরলালের অনেক ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলো (যেমন ইন্দিরা গাঁধির বিবাহের সময় পৃথিবীর দুবার নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী ম্যাডাম কুরী যেহেতু পারিবারিক বন্ধু ছিলেন, ইন্দিরাজীর বিবাহের সময়ে অবশ্যই স্বাধীনতার আগে এবং ম্যাডাম কুরী নেহেরুর বাসস্থান তিনমূর্তি ভবনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে রাজীব গাঁধির জন্ম স্বাধীনতার আগে (১৯৪৪ সাল হয়) নেহেরুজী তাঁহার বন্ধুদের রাজনৈতিক বন্ধু ভাবতেন। পরবর্ত্তীকালে আমরা দেখবো শেখ আবদুল্লার বন্ধুত্বকে তিনি দেশ ও জাতির উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ব্যক্তিগত সমীকরণে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কেউ বন্ধু নয়, কেউ শত্রু নয়। জাতীয় স্বার্থই একমাত্র বন্ধু। ইতিহাস বলছে ১৯৫৩ সালে শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণের পর শেখ আবদুল্লা চিন সফরে যান। জনশ্রুতি যে শেখ আবদুল্লা চৌ এন লাইয়ের সাহায্যে জম্মুও কাশ্মীরকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই ১৯৫৩ সালে পিকিং সফরের পর জুলাই মাসে দিল্লী বিমান বন্দরে বন্দী ছিলেন। তারপর শেখ আবদুল্লা প্রায় ষোলো বছর বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। নেহেরুর জীবদ্দশায়

শেখ আবদুল্লা বন্দীমুক্ত হননি। শেখ আবদুল্লা ইন্দিরা গাঁধির প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় তার বন্দীমুক্তি হয়। শেখের রাজনৈতিক জীবন আর ফিরে আসেনি)। জওহরলাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে পরম বন্ধু বলে ভাবতেন। তার মতে মৌলানা আজাদ যুক্তিবাদী এবং যুক্তিবাদের ভিত্তিতে ইসলামী শাস্ত্র বিচার করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেস তথা হিন্দুদের সহায়তা গ্রহণের ব্যাপারটা মৌলানা আজাদ হজরত মোহাম্মদের মদিনায় ইহুদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনের ঘটনার ব্যাপারটা তুলনা করেছিলেন। এটা কোনও সৎ বিচার নয়। কারণ হাদিশে আছে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের পর মদিনায় ইহুদীদের বিতাড়ন অথবা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণের মধ্যে একটা বেছে নিতে বলেছিলেন। জওহরলাল মৌলানা আজাদ সম্পাদিত ''আল হিলাল' সম্পাদিত পত্রিকার পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। কিন্তু সেই আল হিলাল পত্রিকার উদ্দেশ্য কি ছিল? মৌলানা আজাদ লিখেছেন-- 'যে মৌলিক ভিত্তির উপর আমরা আল হিলালের'-এর সৌধটি নির্ম্মাণ করতে চাই তা হলো প্রতিটি কর্ম্ম ধর্ম্মের অধীন। কোরান ছাড়া কিছুই নাই। কোরানে যা আছে তাছাড়া আমরা কিছুই জানি না। ধর্ম্ম থেকেই আমরা রাজনীতি শিখেছি। আমরা বিশ্বাস করি কোরান ছাড়া অন্য কিছু থেকে সংগ্রহ করা কোনও ধারণা সুস্পষ্টভাবে নাস্তিকতা এবং এই কথা রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত। আজাদ আরও লিখেছেন আমাদের সম্পর্ক শুধু আল্লাহর পন্থার জন্য ইসলাম অনুযায়ী জনগণকে হিন্দুদের অনুসরণ করতে হবে না....মুসলমানদের কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদানের দরকার নেই। বহু বছর ধরে তারা পৃথিবীর মানুষদের তাদের দলে যোগ দিতে এবং তাদের অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে--তারা আল্লার দলের অন্তর্ভুক্ত। আরো অনেক কিছুর মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও আল হিলাল তোমাদের বলছে সরকারের উপর অত্যাধিক অপ্রাপ্য আস্থা রেখো না। বা হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না।

আল হিলাল থেকে মৌলানা আজাদের একটি লেখা ঃ- হিন্দু জাতির মতো সেকুলার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাদের আত্মসচেতনা ও জাতীয় চেতনার পুনর্জীবন ঘটাতে পারে কিন্তু এটা মুসলিমদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের জাতীয়তা সমস্ত মানব গঠিত বাধা অতিক্রম করে। সুতরাং ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে মুসলিমদের আত্মচেতন গড়ে উঠবে না। জাতি ও মাতৃভূমির ধারণা থেকে ইউরোপ অনুপ্রাণিত হতে পারে। মুসলমানরা অনুপ্রেরণা অনুসন্ধান করতে শুধু আল্লাহ ও ইসলামের কাছ থেকে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এইটা স্বচ্ছ যে আল হিলালের মৌলানা আজাদ ছিলেন মৌলবাদী ও দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে সমান স্পষ্ট আজাদ ও আল হিলাল সম্বন্ধে জওহরলালের সীমাহীন অজ্ঞতা।

এহেন মূঢ়, দাম্ভিক ও পল্লবগ্রাহী জওহরলাল আমাদের কাশ্মীর নাটকের প্রধান অভিনেতা। অনেক ঐতিহাসিকগণ জওহরলালের চরিত্রগতভাবে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখতে পাই। তাদের মতে জওহরলাল জন্মের দিক থেকে হিন্দু। কাজের বিশ্লেষণে মুসলিম এবং চিন্তাধারার

দিক থেকে পুরোপুরি ইউরোপীয়। আমরা এই প্রবণতা নেহেরু পরিবারের প্রতিজনের মধ্যে দেখতে পাই। নতুবা ১০ বৎসরের ইউ. পি. এ সরকারের অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে শহর এলাকায় প্রতিটি নাগরিক দৈনন্দিন প্রয়োজন ৩৪ টাকা, গ্রামীণ এলাকায় ২৬ টাকা, অথচ যে আমলা এই মাপকাঠি অনুমোদন করেছিলেন সেই পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারমেন যখন বিদেশে সরকারী কাজে যেতেন তাঁহার দৈনিক হোটেল ভাড়া ছিল ৫০০ ডলার। (অর্থাৎ দৈনিক ৩২০০০ টাকা)।

এভাবে আমরা নেহেরু পরিবারের উত্তরশূরীদের মধ্যেও এরকম মানসিকতা দেখতে পাই। অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার রাম সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আমরা জানি যে রাম সেতু ব্যাপারটা বিতর্কিত। রামের নামে ভারতে কিছু করা যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত আছে যে রামচন্দ্র সেতু বন্ধন করেছিল। কিন্তু ইউ পি. এ সরকার রামসেতু গড়তে রাজী নয় যদিও এই প্রকল্প আর্থিক দিক থেকে সাশ্রয়কারী। কিন্তু কারণটা অন্যত্র লুকিয়ে আছে। যেহেতু জাহাজ মন্ত্রী ডি.এম.কে দলের এবং তাহারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী তাহারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিশোধে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাম সেতুতে আপত্তি করে। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে সেতুবন্ধ শিলারাশি ৫০০০ বছরের পুরোনো অর্থাৎ মানুষ রামের নির্দ্দেশে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিলো।

কাশ্মীর নাটকের দ্বিতীয় কুশীলব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে। পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারত বিখ্যাত শিক্ষাবিদ। আইনজীবীও কলিকাতা হাইকোর্টের জজ। স্যার আশুতোষ মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী হলেও ছাত্রজীবনের পরে কোনও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয়দের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে এক কিংবদন্তীতুল্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাঠকদের মনে রাখা উচিৎ যে বৃটিশরা ১৮৫৭ ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সী শহরে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিনটি হলো কলিকাতা, বোম্বাই (মুম্বাই) ও মাদ্রাজ (চেন্নাই)। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য জাতপাত, ধর্ম ও প্রাদেশিকতাকে কোনও স্থান দেননি। ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলিকে তিনি অধ্যাপনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন।

তিনি ভারতে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাপ্ত স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ পাশ করেন।

কি প্রতিভার, কি দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাঁহার পিতার অনুবর্তন। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন প্রতিভাবান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.বি.এল, পি.এইচ.ডি এবং

লিংকনসাইন-এর ব্যারিস্টার। কিন্তু নিজের বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ করে অর্থ উপার্জনের কোনো আকাঙ্ক্ষা তাহার মধ্যে ছিল না। জনসেবা ও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জনসেবাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনসেবার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রেই প্রথম পদার্পণ করেছিলেন শ্যামপ্রসাদ।

১৯২৪ সালে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর শ্যামাপ্রসাদ সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের শিরোপাও শোভিত হয় তাঁর মস্তকে। উপাচার্য হিসাবে বাংলা ভাষায় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৭ সালের সমাবর্তন উৎসবের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রথা ভঙ্গ করে প্রথম বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন (এখানে বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে তার আই.বি. বিভাগের অনুসন্ধান হয়েছিল।

শিক্ষাবিদ হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ গোটা ভারতেই সম্মানিত ছিলেন। বহু বিশ্ব বিদ্যালয়েই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার জন্য তাঁহার ডাক পড়তো, কলাকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের পদ ছাড়াও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির সম্মানীয় পদটিও তিনি লাভ করেন।

শ্যামাপ্রসাদ যখন ছাত্র গাঁধিজী তাহার অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন, সেই ১৯২১ সালে। কিন্তু এই আন্দোলনটি তাহার মনে কোনও রেখাপাত করেনি। প্রসঙ্গত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ১৯১৬ সালে বিলাত থেকে ফিরে আসেন। তিনিও কিন্তু গাঁধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নি। স্যার আশুতোষ গাঁধিজীর ডাকে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসার বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার এই সামান্যতম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া আত্মহত্যার সামিল। শ্যামাপ্রসাদ বিভ্রান্তকর কংগ্রেসী রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। ১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বর্জন নীতি গ্রহণ করলে তিনি আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে গাঁধিজী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে তিনি তাতেও যোগদান করলেন না। তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি পরিত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করলেন শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারের কাজে। ১৯৩৮ সাল অবধি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই নিয়োজিত করলেন।

ভারতরক্ষা আইনবলে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ডের আইনের বলে (Defence of India Rules) ভারতে প্রতিটি প্রদেশে আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। যদিও কেন্দ্রীয় শাসন ভাইসরয় কাউন্সিলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯৩৭ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে কংগ্রেস অংশগ্রহণ করে। শ্যামাপ্রসাদও নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে ওই নির্বাচনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান সাফল্যের লোভে মুসলীম প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আবার কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশ পুনর্গঠনের পরে পরোক্ষে মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। এক কথায় কংগ্রেস মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল তকমাটি লেহন করে এক ধরনের তোষণবাদে লিপ্ত হয়। এস ওয়াজেদ আলীর কথায় সেই ট্রেডিশন সমানে চলছে। অন্যদিকে ত্রিশের দশকে মুসলিম মানসে পাকিস্তান তৈরীর চিন্তার উদয় হয়। তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য কায়েম করে মুসলিম লঘিষ্ঠ অঞ্চলে নিজেদের অবস্থান সুবিধাজনক করার জন্য তৎপরতা আরম্ভ করে। এই সব পরিকল্পনাকারীদের সর্বপ্রথমেই প্রথমে যার নাম উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন স্যার মহম্মদ ইকবাল। (অথচ আমাদের মধ্যে যারা ভারতে তাঁর 'সাঁরা জাহাসে আচ্ছা' গানটি আমাদের দেশে একটি দেশপ্রেমের সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার ইকবালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। অবশ্যই জওহরলাল নেহেরুর নামও বড় বড় অক্ষরে খোদাই করা আছে। অন্যান্য মুসলিম নেতারা হলেন চৌধুরী রহমত আলী, আগা খাঁ, সিকন্দর হায়াৎ খাঁ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদালয়ের কিছু অধ্যাপক (অবশ্য এই জায়গাটা এখন নিয়েছে দিল্লীর জে. এন. ইউ, কারণ এখান থেকে ভারত বিরোধী সিতারাম ইয়েচুরী, কানাইয়া কুমার, উমল খালিদ প্রমুখের জন্ম) এবং তার পরে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক লতিফ এবং ছদ্মনামী এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক হায়দ্রাবাদের সেই ট্রেডিশন আজও চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ এখানে রহিত ভেমুলারের মতো ছাত্ররা দলিতদের নাম করে দেশ ভাগ করার চেষ্টা করছে। তখনকার সময়ে এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সবার চিন্তায় স্বাধীন পাকিস্তানের কথা না থাকলেও এবং সবাই পাঁচটি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পূর্ণ কর্তৃত্ব চাইতেন। সেই সঙ্গে চাইতেন দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম স্বার্থের পূর্ণ সংরক্ষণ। অনেকটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্য মন্ত্রীর মতো। তিনিও স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে আমি ৩১ শতাংশ মুসলিমদের স্বার্থ দেখবই। তাই তিনি প্রতি জেলাতেই হজ হাউজ নির্মাণ করছেন মুসলমানদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলিমদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, সেটা স্বাধীন ভারতে অন্য কোথাও নেই। কংগ্রেসী নেতাদের এইসব মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য আজকের নয়, স্বাধীনোত্তর ভারত থেকেই। মুসলমানদের পদলেহন করাই তাদের কাজ। ফলে তারা মুসলমানদের নিত্য নতুন দাবীর সঙ্গে ক্রমাগত প্রশাসনিক দরকষাকষি ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতেন না। অতএব কংগ্রেসের মুসলিম জনসংযোগ নামে মাত্রই ছিল। কারণ ওই পদটা গাঁধিজীর Blue eyed Boy জওহরলাল নেহেরুর জন্য বরাদ্দ ছিলো। সে সময় জিন্নার দাপাদাপিতে কংগ্রেস ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে পাঠায় জিন্নার ক্রোধ প্রশমনের জন্য।

এইভাবে কংগ্রেসের পোকায় কাটা সেকুলারবাদ অন্যদিকে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ভারতীয় রাজনীতির ওই দুই ক্ষতিকর প্রবণতা দেখে দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভার দিকে

আকৃষ্ট হন। তোষণবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও তার উচ্চারিত নিষ্কলঙ্ক বাস্তববাদী জাতীয়তাবাদী শ্যামাপ্রসাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিদেশী সরকারের "ভাগ করে শাসন করো" নীতির সঠিক প্রতিষেধক হিসাবে হিন্দু মহাসভার রাজনীতিই শ্রেয় বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে "সাম্প্রদায়িক" হিন্দু মহাসভা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার মনে হয়।

হিন্দু মহসভার উৎস ১৯০৭ সালের পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সভা। এই হিন্দু সভা ছিল অরাজনৈতিক সংঘ। উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা এবং এই সঙ্গে সর্বতোভাবে হিন্দুজনের সেবা করা। এরপরে ১৯০৯ সালের অক্টোবরে লাহোরে (এখন পাকিস্তানে) পাঞ্জাব প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন অধিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে লালা লাজপত রায় ঘোষণা করে হিন্দুরা একটা জাতি। কারণ তারা নিজস্ব একটি সভ্যতার ধারক। অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি বলেন, অন্য ধর্মে বিশ্বাসী আমাদের দেশবাসী সম্পর্কে আমাদের কোনও আশঙ্কা নেই। তারা যদি নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চায় এবং স্ব-সম্প্রদায়ের সুবিধা দেখে তাহলে আপত্তি করার কিছু নেই। যতদিন না তাহারা অভারতীয়দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দুদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে, ততদিন তারা নিজেদের পূর্ণাঙ্গ ভারতীয় বলে মেনে নিতে পারবে না। তিনি আরও বলেন এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দ্বারা উদ্বোধিত হিন্দু আন্দোলনের যে কেউ যোগ দিতে পারেন। যদিও তিনি হিন্দু পতাকার তলে সমবেত হওয়ায় সুনামের চেয়ে দুর্নামই বেশি পেয়েছেন। লালা লাজপৎ রায়ের ঘোষণার মধ্যেই হিন্দু মহাসভার মূল নীতি উচ্চারিত।

হরিদ্বারে ১৯১৪ সালে বসল অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশন। এই অধিবেশনে যোগ দিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এরপরে কংগ্রেসের অধিবেশনের মণ্ডপেই বার বার অধিবেশন হতে লাগলো হিন্দু মহাসভার অধিবেশন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময় মহাত্মা গাঁধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গাঁধী ফিরে আসেন নি। ১৯২৮ সাল অবধি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও লালা লাজপত রায় হিন্দু মহাসভাকে টেনে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ক্রমশই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিশেষতঃ গাঁধী-নেহেরু সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য বাড়তে লাগলো। গাঁধীজির অহিংস নীতি মহাসভা নেতারা ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। এই মত পার্থক্য প্রকট হলো গাঁধিবাদী ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জ্জন নীতির' পরিপ্রেক্ষিতে। এইখানে বলে রাখা ভালো যে কংগ্রেস সেই সময় Communal award (সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে কোনও বিশেষ আন্দোলন করতে পারল না। এই বিষয়ে একটি কথা বলা যায় যে কংগ্রেসী নেতারা তখন স্বরাজ চাই, না স্বাধীনতা চাই সেটাই ঠিক করতে পারল না।

এখানে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিচ্ছেদের ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। ১৯২৮ সালে এম. আর. জয়াকারের অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার বিচ্ছেদের ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। ১৯২৮ অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হলো যে তাহারা কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি, হিন্দু মরে কর্ম দোষে তার আমরা কি জানি' এই নীতি নিয়েছিলে। বৃটিশরা চেয়েছিল যে তাদের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা দ্বারা ভারতীয়দের বিভক্ত করে আরো কিছুদিন ভারতের স্বাধীনতা ঝুলিয়ে রাখা। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দু মুসলমানদের আলাদা নির্বাচনী এলাকা হবে জনসংখ্যা অনুযায়ী। পরে অবশ্য এন. সি. কেলকার হিন্দু মহাসভা ছেড়ে লিবারেল পার্টিতে যোগদান করেন। এর মধ্যে বৃটিশ সরকার চেয়েছিল যে তারা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্ত শাসন দান করবে। কিন্তু যেহেতু ভারতে বহু করদ ও মিত্র রাজ্য আছে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তেমন মজবুত নয় তাই ভারতকে Dominion Status বা স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া সমীচীন নয়। এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য লন্ডনে পর পর দু'বছর বিলেতে গোল টেবিল নামক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু কোনও বারই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক জীবন স্বল্পকালের হলেও রাজনৈতিকতার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। জওহরলালের মতো তিনি আবেগ ও ভ্রান্ত তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হতেন না। তারা প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল বাস্তব মুখী। যেকোন তত্ত্বের চেয়ে দেশ ও মানুষই বড় ছিলো তাঁর কাছে। ১৯৩৭ সালে বঙ্গদেশে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে কংগ্রেস বৃহত্তম দল হলেও এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফজলুল হকের প্রজাপার্টি ও সুরাবর্দ্দি নাজিমুদ্দিনের মুসলীম লীগ সবকটি মুসলিম আসন জয় করে নেয়। বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু, কৃষক প্রজাপার্টির সহযোগিতায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে আপত্তি জানানোয় ফজলুল হক মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারলেন না। কংগ্রেসী নেতাদের মূঢ়তার ফলে পালে বাতাস লাগালো মুসলিম লীগের। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে নাজিমুদ্দিন ফজলুল হক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে গেলো। এর পরে আবার কংগ্রেসের সুযোগ এলে নতুন এক কোয়ালিশনের জন্ম দিয়ে। বিধিবদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রী কিরণশঙ্কর রায় মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহে ফজলুল হকের নেতৃত্বে আবার নতুন মন্ত্রীসভা গড়ে উঠল। এই মন্ত্রীসভাকে লোকে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা বলতো। শ্যামাপ্রসাদই মন্ত্রীসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তখনকার বিধান অনুযায়ী প্রজা ও জমিদারদের জন্য আলাদা নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল। উক্ত একটি কেন্দ্র থেকে কাশিম বাজারের রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র নন্দী বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। তাই খবরের কাগজে হেড লাইন হলো রাজা মহাশয়ের মন্ত্রীরূপে প্রমোশন। এইভাবে হকের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করে অন্তত কিছুদিনের জন্যও মুসলিম লীগকে বাংলার ক্ষমতার আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন কুশলী রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদ।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের পরিচয় পুনরায় প্রদান করলেন দেশভাগের সময়। যদিও তিনি বরাবর দেশ ভাগের বিপক্ষে মন্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন দেশ ভাগ অনিবার্য্য এবং নানাভাবে চক্রান্ত চলছে গোটা বঙ্গদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। তখন তিনি বঙ্গদেশ ভাগের নেতৃত্ব দেন। গোটা বঙ্গদেশ পাকিস্তান হলো কি হলো না এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের খুব বেশী মাথা ঘামাতেন না। তারা তখন দিল্লীর মসনদ দখল করার জন্য ব্যস্ত। কে কত তাড়াতাড়ি লালকেল্লা দখল করবে। অন্যদিকে সুরাবর্দী আবুল হাসিম চক্রান্ত করে শরৎবসুকে এবং কিরণ শঙ্কর রায়কে বশ করে "স্বাধীন বঙ্গদেশ" নামে এক নতুন পাকিস্তান করার চক্রান্ত করেছিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে, সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে বঙ্গদেশ বিভাজন চূড়ান্ত করলেন। শ্যামাপ্রসাদ যদি এ ধরনের রাজনৈতিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব না দেখাতেন এবং বঙ্গবিভাগে নেতৃত্ব না দিতেন তাহলে শরৎ বসুর ভাবাবেগ, কিরণ শঙ্করের মূঢ়তা ও সুরাবর্দী হাশেমের চক্রান্তই জয়ী হতো। বিগত ৪০ বৎসর ধরে যারা ধূতি পরে পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব চালাতেন তাঁদের একজনকেও মহাকরণের ত্রিসীমানায় দেখা যেতো না। রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসাবেই শ্যামাপ্রসাদ দু'বার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন, একবার বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় আর একবার ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। তিনি বৃহৎ শিল্পমন্ত্রী ছিলেন। অনেকের অনুমান স্বাধীনতার পরে মহাত্মা গাঁধির অনুরোধে তিনি হিন্দু মহাসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু নেহেরুর কংগ্রেসী সরকার তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করেছিলেন। ১৯৫০ সালে যখন সমস্ত পূর্ববঙ্গে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছিল এবং নেহেরু-লীয়াকত চুক্তিতে কোনও কঠিন ধারার যোগ না থাকায় তিনি ও তাহার সহকর্মী ক্ষিতীশ নিয়োগী নেহেরু মন্ত্রী সভার বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা যৌথভাবে পদত্যাগ করলেন। শ্যামাপ্রসাদের মন্ত্রীত্বের উপর কোন মোহ ছিল না। শিল্প মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি শিল্পের অনেক বাধা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ তাঁরই চিন্তার ফসল। জওহরলালের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংঘাত ছাড়াও নীতিগত বিরোধ বাধে। নেহেরু পশ্চিম পাঞ্জাবের তুলনায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী দেশ যখন কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করেন তখন সে রাজ্যের ব্যাপারে আলোচনা কিংবা চুক্তি করে তখন সে রাজ্য এ ব্যাপারে জড়িত থাকে এবং সেই রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির আগে ও পরে শ্যামাপ্রসাদ কিংবা ক্ষিতীশ নিয়োগীর সঙ্গে কোনও আলোচনাই তিনি করেন নি। এবিষয়ে জওহরলালজী একটা একনায়কতন্ত্র দম্ভও প্রকাশ করেছিলো।

শ্রীমতী ইন্দিরা গাঁধীরও এ বিষয়ে "দুর্নাম" ছিলো। সংবাদপত্রের রিপোর্টে এটাও জানা যায় ইন্দিরা গাঁধীর "দরবারে" যখন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের তাঁহার চেম্বারে ডাকতেন, শ্রীমতী

গাঁধী রাজ্যের নেতাদের বিরুদ্ধে "ইনটেলিজেন্স" (অনুসন্ধান বিভাগের গোপন রিপোর্টের মাধ্যমে) তাদের "বিশ্বাস ঘাতকের" (Blackmail) কাজ করতেন। নেহেরু পরিবারের লোকদের ধারণা ছিলো যে তাঁহারাই একমাত্র ভারতকে একচ্ছত্র শাসন করতে এসেছেন।

শ্যামাপ্রসাদের সহিত তুলনামূলকভাবে জওহরলালের মানসিকতা ছিলো অন্যরকম। ১৯৬০ সালে ইংরাজ সাংবাদিক যখন নেহেরুর এক সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তখন নেহেরুজী বলেছিলেন, "যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দেশ ভাগের পরিকল্পনা আমাদের কাছে একটা "পথের" প্রস্তাব দিলো এবং আমরা তাই গ্রহণ করলাম।" অর্থাৎ ক্ষমতা উপভোগের জন্য জহরলাল ভারত ব্যবচ্ছেদে সায় দেন। এ-কথা সবাই মনে রাখবেন যে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন নেহেরুর বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর। এই পদে তিনি একনাগাড়ে ১৭ বৎসর দেশ চালিয়েছিলেন। তার এই রেকর্ড কেউ ভাঙ্গতে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদ দক্ষিণ কলকাতা লোকসভায় দু'বার নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি সদর্পে নেহেরুজীকে দম্ভের সহিত বলতে পেরেছিলেন আপনারা দেশকে ভাগ করেছেন কিন্তু আমরা জিন্না সাহেবের পাকিস্তানকে দু'টুকরো করেছিলাম। তিনি বলেছেন "You have divided the country but we have been able to make a disunited the Pakistan by dividing Punjab And Bengal)।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উপর তাদের জাতিক্রোধ। কিছুদিন আগে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীমণি শঙ্কর আয়ারের তিনটি ন্যক্কারজনক কার্যকলাপের কথা বলতে হয়। কিছু দিন আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যখন কূটনৈতিকী শিষ্টাচার ভেঙ্গে মণিশঙ্করের বাড়িতে এক ভোজ সভায় গিয়েছিলেন। তার পরদিন মণিশঙ্কর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে "নীচ ইনসান" বলে এক নীচু স্তরের রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। প্রায় দশ বছর আগে যখন অসামরিক বিমানমন্ত্রী যেহেতু পোর্টব্লেয়ার বিমান বন্দরে যে সাভারকারের কাটআউট ছিলো শ্রীমণিশঙ্কর তার নামাঙ্কিত ট্যাবলোটি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন ঘটনা ভারতের প্রসাশনিক ইতিহাসে দেখা যায়নি। নেহেরু পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীমণিশঙ্কর একটা বই লিখে ফেলেন যার নাম হলো "I am fundamentally a secularist" অনেকে বলেন যে তিনি নেহেরু পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই কেতাব লিখেছিলেন। এই মণিশঙ্কর একবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে "নালায়ত" বলে সম্বোধন করেছিলেন। শব্দগত অর্থে এ শব্দের অর্থ "নির্বোধ" এই মানসিকতার জন্য ক্যাম্ব্রিজের ট্রাইপজ মণিশঙ্করের বাক্যবাণের তুলনা নেই।

কাশ্মীর নাটকের তৃতীয় চরিত্র হলেন মোহনদাস গাঁধী। গাঁধিজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক। তার কারণ তিনি যে শুধু দীর্ঘকাল এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাই নয়। ভারতের ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সবাইকে তিনি এই সংগ্রামে তাঁর প্রশস্ত ছত্রতলে এনে

দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। অন্যান্য যাবতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁর তুলনায় নিতান্তই "বাবু ও বামন"।

যেহেতু নেহেরু পরিবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে প্রায় ছয় প্রজন্মের শীর্ষ পদে রয়েছে। তাই বিরোধীরা রাহুল গাঁধীকে Pappu অর্থাৎ আদরের বাচ্চা বলে সম্বোধন করতেন। তাতে কংগ্রেসীরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছিলেন। তখন নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিল যে রাহুলকে তার পরিবর্তে 'শাহাজাদা' বলা যাবে।

কাশ্মীর নাটকের তৃতীয় চরিত্র মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী। গাঁধীজি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক।

গাঁধীজির যথার্থ মূল্যায়ন করা আজও সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁর চরিত্র, অ-স্বচ্ছ ও কুহেলীপূর্ণ।

মানসানুগতভাবে তাঁর বিচার করা অসম্ভব। যদিও তাঁকে নিয়ে পাতার পর পাতা লেখা হয়েছে বহুকাল ধরে এবং হবেও বহুকাল ধরে। সুতরাং স্বল্প পরিসরে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতের ইসলাম সম্বন্ধে তাঁহার ধ্যান-ধারণার কথাই আলোচিত হবে। কারণ সমস্যা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা।

গাঁধীজি মনে করতেন সব ধর্মই এক। সর্বধর্ম একই ঈশ্বরের আরধনা করে। ইসলাম ও এই সত্যের ব্যতিক্রম নয়। রাম ও রহিম এক। ঐতিহাসিকরা তার এই তত্ত্বকে রাম রহিম তত্ত্ব বলে অভিহিত করেন। ইসলাম সম্পর্কে ধারণার জন্য বিষয়ানুগভাবে কোরান-হাদিশ থেকে অজস্র বাক্য উৎকলিত করার প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটা নিয়ে মানসানুগ ভাবেই আলোচনা করা যেতে পারে।

ইসলাম ধর্ম বহুলাংশে ইহুদী ধর্মের অনুবর্তন। ইহুদী ধর্মের বিভিন্ন পয়গম্বর ইসলাম ধর্মেরও পয়গম্বর। যেমন ঃ তোমরা বলো আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের কাছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, এয়াকুব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (এখানে বলা ভালো যে সদ্য প্রয়াত নায়ক শশী কাপুর বিখ্যাত সিনেমা 'শেক্‌সপীয়ার ওয়ালা' সিনেমার প্রযোজক ছিলেন ইসমাইল মার্চেন্ট) এবং যা তাদের প্রতিপালকদের নিকট থেকে ঈশা, মুসা, অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত যদিও উৎপত্তিগতভাবে ইসলাম ও ইহুদী এক সূত্রে বাঁধা, ধর্মীয়বাসীতে একজন অপর জনের সঙ্গে প্রায় একরকম অহিনুকুল সম্পর্ক। আরবীয়রা কিছুতেই ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নেবে না। আরবরা জেরুজালেমে ইসরাইলের রাজধানী মানতে চাইছে না এবং ২০০৯ সালে ভারতে ২৬/১১ মুম্বাই দাঙ্গার সময় ইসরাইলী সেনাগগ আক্রমণ করেছিল।

ইহুদী ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা হিব্রু বাইবেল ইসলামে সম্মানীয় গ্রন্থ। এবং কোরানে "তৎবাত বা তওবাত" নামে বিবৃত। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী ঈশ্বর যিহোভা তার মনোনীত

জন ইহুদীদের বসবাসের জন্য প্রতিশ্রুতি ভূমি তরবারীর তীক্ষ্ণতায় দখল করার জন্য পয়গম্বর মুসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হিব্রু বাইবেলের তীক্ষ্ণতার দখল করার জন্য মুসা ও তার উত্তরসূরী যুশা থিহোভার আদেশ পেয়ে প্রতিশ্রুতি মতো নানা প্রদেশের যাবতীয় নরনারী গবাদি পশু সমেত ধ্বংস করেছিলেন এবং কিভাবে নগ্ন নির্মতার সঙ্গে ধ্বংস করেছিলেন অন্যান্য যে সমস্ত প্রদেশে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল, সেই সমস্ত প্রদেশ শহরগুলিতে। নানা প্রদেশের বহিঃস্থ শহরগুলিকে আক্রমণ করে তারা সমস্ত পুরুষ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। লুণ্ঠন করেছিলেন যাবতীয় সম্পদ ও নারী। এরকম অবস্থাই দেখতে পাই যখন ভারত স্বাধীনতার ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্থানী আদিবাসীগণ শ্রীনগর আক্রণ করেছিলো।। এমনটা দেখা গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালী দাঙ্গার সময়। যখন মহাত্মা গাঁধী যাত্রা করেছিলেন মুসলমানদের হৃদয় পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুরাবর্দীর কোনও হৃদয় পরিবর্তন হয়েছিলো কিনা জানি না। একটা বিষয়ে এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে নেহেরু ও গাঁধী তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের উপর সারা ভারতে সমস্ত মুসলমানদের দ্বারা নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে তখন একবারও তাঁহাদের হৃদয় কাঁপেনি। এই ঘটনাকে টলষ্টয়ের রাজনৈতিক অনুগামীরা মহাত্মা গাঁধীকে "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মহান প্রহরী" নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এটা সত্যি করে বলা যায় যে মহাত্মাজী চিরকালই রাজনৈতিক কারণে যখন জেলবন্দী থাকতেন তিনি কোনও সাধারণ জেলখানায় থাকতেন না। তিনি সপরিবারে (কস্তুরী গাঁধীর সহিত বিড়লা ভবনে থাকতেন)। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় বিড়লা হাউসে আততায়ী নাথুরাম গডসের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। জনশ্রুতি বিড়লাদের প্রধান শ্রী ঘনশ্যাম বিড়লার কংগ্রেসীদের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্বের নৈকট্য ছিল। এই নৈকট্যের জন্য অন্য কোন শিল্পপতি স্বাধীনতার প্রায় ২৫ বৎসর অবধি যাত্রী বহনকারী গাড়ী উৎপাদনের লাইসেন্স পায়নি। এরকম একনায়কতান্ত্রিক উৎপাদন অনুমতি ভারতে দুটি পাওয়া যায়নি। মারুতিই একমাত্র গাড়ি উৎপাদনকারী সংস্থা যে এই বেড়াজাল ভাঙ্গতে পেরেছিলো। অবশ্য তার পাল্টা যুক্তিও আছে, শোনা যায় জিডি বিড়লার একটি ইস্পাত শিল্প গড়ার বাসনা ছিল। সেক্ষেত্রে টাটারা তাদের প্রায় একনায়কতন্ত্র বজায় রেখেছিল। বিড়লারা আজ পর্যন্ত বৃহৎ ইস্পাত শিল্পে কোনও বিনিয়োগ করেনি। জনশ্রুতি আছে যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যখন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন তখন গাঁধিজী বিতর্কিত শিল্পপতি খৈতানকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। এবং আশ্চর্যের বিষয় ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নি। ওই সময় সংবাদ মাধ্যমে এই ব্যাপারে শোরগোল উঠেছিলো। সংবাদ সমক্ষে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সেই চিঠি জনসমক্ষে এনেছিলেন। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে ডাঃ ঘোষ জাতির পিতার নির্দেশ অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিলেন। অতএব মহাত্মা গাঁধী যে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যাপারে নিষ্কলঙ্ক ছিলেন এটা শপথ করে বলা যায় না।

যে কথায় ছিলাম সেই কথায় ফিরে আসা যাক। হিব্রু বাইবেল এইভাবে জন্ম দিয়েছিল এক মানবতা বিরোধী ঈশ্বরের আপনজন ও প্রতিশ্রুতিভূমি ধারণা যুগলের। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের প্ররোচনায় পৃথিবীর মানব সমাজ বিভক্ত হয়ে যায় দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে। এক শিবির ঈশ্বরের আপনজন, অন্য শিবির তার শত্রু। তরবারী তীক্ষ্ণতায় ধর্ম্মযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত ভূমি আপনজনের লক্ষ্য। পরবর্তীকালে অন্য দুটি সেমীয় ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলাম এই ধারণা যুগলের আদলে তৈরী হয়। আরও পরবর্তীকালে এই ধর্ম্মীয় ধারণাযুগলই রূপান্তরিত হয় উপনিবেশবাদ, নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদে। উপনিবেশবাদ, নাৎসীবাদ ও সাম্যবাদের কেন্দ্রে ঈশ্বর না থাকলে মতবাদগুলিতে পৃথিবীর মানবসম্পদকে দুটি বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত করার নীতি বর্তমান।

জন্মসূত্রে হিন্দু গাঁধীজি রাম ও রহিমকে এক বললেও ইসলাম অন্য ধর্ম স্বীকার করেন না। হিন্দুরা ঈশ্বরের আপনজন নন। সুতরাং মানসানুগ ভাবে গাঁধীজির **রাম রহিম তত্ত্ব** ভ্রান্ত।

এবার ব্যবহারিক তত্ত্বে আসা যাক ঃ- ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯০৬ সালে ঢাকায়। প্রস্তাবের পরে গাঁধীজি সেই সালেই ৬ এপ্রিলে "হরিজন" পত্রিকায় লেখেন "দ্বিজাতি তত্ত্ব সম্পূর্ণ অসত্য" মুসলমান জনসংখ্যার অধিকাংশই ধর্মান্তরিত এবং ধর্মান্তরিতদের বংশোদ্ভূত, ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জাতিত্ব পরিবর্তন হয় না। একজন বাঙালী মুসলমান হিন্দু বাঙালীর মতোই কথা বলে, এক রকমই খায়, একই ধরনের আমোদ-প্রমোদ করে একই ধরনের পোশাক পরিধান করে বাইরে থেকে বাঙালী হিন্দু মুসলমান ভেদ করা মুশকিল। এটা আংশিকভাবে সত্য কেননা সারা ভারতে মুসলমান কি বাংলায়, কিংবা পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে নিজেদের আরবি ভাষায় কথা বলে। সারা ভারতে স্থানীয় ভাষায় মুসলমানের নাম দেখা যায় না। যদিও অধুনা বাংলাদেশে, বাংলা ভাষায় নামের প্রচলন হয়েছে বিশেষ করে পোশাকি নামটা পুরোপুরি বাংলা ভাষায় এবং খুবই গ্রহণযোগ্য বাংলাদেশে ভাষার ভিত্তিতে তৈরী তারা তাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। তারা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তাদের কাছে থেকে দেশপ্রেম ও কৃষ্টি অনুকরণ যোগ্য।

গাঁধিজী ওই পত্রিকায় আরও লিখেছিলেন ভারতের বাকী মানুষদের মতো মুসলিমদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। এই বাক্যের অন্তর্নিহিত সত্য হলো গাঁধিজী মুসলমানদের শুধু ধর্মীয় একক রূপে না দেখে রাজনৈতিক ও সামাজিক একক হিসেবেও দেখেছেন।

এবিষয়ে গাঁধিজীর ও ভারতের কমুনিষ্টদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় শহীদ সুরবর্দীর সঙ্গে শহীদ মিনারের তলায় ১৯৪৫ সালে পাকিস্তানের দাবীতে মিটিং করেছিলেন। পাকিস্তান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যদি এতই ভালো লাগে তবে অবিভক্ত বাংলায় সমস্ত কমুনিষ্টরা দেশ ভাগের পর সুড় সুড়

করে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন কেন? কম্যুনিষ্টদের এই দ্বিচারিতা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা বহুবার প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের সময় গোর্খা নেতা সুভাষ ঘিসিংকে তোল্লাই দিয়ে মাথায় তুলেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ, স্যার মুহাম্মদ ইকবালকে পাকিস্তান সরকার তাদের জাতীয় কবির সম্মান দিয়েছিলো।

পূর্বেই কথা হয়েছে গাঁধিজীর চরিত্র অস্বচ্ছ ও কুহেলীপূর্ণ। তাঁর ক্রিয়া কর্মের যুক্তি বাস্তববাদীদের কাছে প্রায়শই গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনের বহুবার তিনি অনশনে বসেছেন। সেই অনশন কখনও মেয়াদী কখনও আমরণ। তিনি ছয় ছয়বার অনশন করেছেন। প্রথমবার গুজরাটের সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এবং শেষবার ১৯৪৬ সালে কলকাতায় বেলিয়াঘাটায় গাঁধীভবনে (এই বাড়িটি বোম্বাইর এক বৃহৎ শিল্পপতির গাঁধীকে উপহার দেওয়া) গাঁধিজীর রাজনৈতিক জীবনে বৃহৎ শিল্পপতি নিয়ে বিশেষ কোনও দ্বন্দ্ব হয়নি। গাঁধিজীর জীবনের আরও দুইটি নাটকীয় উপাদানের কথা বলবো যখনই কোনো বিতর্কিত সমস্যার উদ্ভব হতো তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। আমরা পুরাণে কিংবা ধর্মগ্রন্থে দেখেছি মুনি ঋষিরা মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে এর জুড়ি মেলা ভার।

দ্বিতীয় আর একটা নাটকীয় ব্যাপার হলো, তাঁর ব্রহ্মচর্য পালন করা। এটা কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রকাশ করার সাহস দেখায়নি। এসবই গাঁধিজীর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। এই খবরটা প্রকাশিত বিশিষ্ট ফরাসী লেখক Dominique Lappiere রচিত Freedom at Midnight পুস্তকে। এখানে বলে রাখছি ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছিলো ১৪ আগস্ট রাত্রি ১২টার সময় (১৯৪৭ সালে মধ্যরাত্রে)। এই পুস্তকে বর্ণিত আছে গাঁধিজী রাত্রে দুইজন অষ্টাদশী তরুণীর সঙ্গে নগ্ন দেহে শয়ন করতেন। তরুণীরা সুবেশে শয়ন করতেন কিন্তু গাঁধিজী নগ্ন দেহে শয়ন করতেন। কথিত আছে একজন তরুণী উত্তেজনা বশত মধ্যরাতে গাঁধিজীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। গাঁধিজী উত্তেজিত হয়ে মারতে মারতে শয়নঘর থেকে তাকে বের করে দিয়েছিলেন। এই সবই সংবাদদাতার আখ্যান অনুযায়ী, কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়নি।

গাঁধিজীর এই সমস্ত অনশনও সবর্দা যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন হয়নি। অনেকেই বলেন এইগুলি সবই লোক দেখানো কিংবা সহানুভূতি আদায়ের। গাঁধিজীর অনশনের সময় তাঁর জীবন রক্ষার জন্য প্রথাগত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। অনেকেই বলেন এই জাতীয় "আবেগ প্রদান"(Commotion Technique) কথা এখানে উল্লেখ করা উচিৎ। যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন বৃটিশ রাজ প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম কেনার জন্য ভারতবর্ষকে ৪০০ কোটি টাকা অনুদান দিলেন। মহাত্মা গাঁধী কোনও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদাধিকারী না হয়েও তিনি বায়না ধরলেন যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতকে তাঁর সপ্তমাংশ অর্থাৎ ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দিতে হবে। এটা কিরকম আব্দার! কারণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭০

দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৪ অক্টোবরের ১৯৪৭ পাকিস্তানী সৈন্য ভারত আক্রমণ করে বসলো। তখন সমস্ত ভারতীয়দের মধ্যে একটা আতঙ্কের শিহরণ জাগলো। কারণ ভারতীয়দের মধ্যে ভয় ঢুকলো যে, এই টাকা ভারত আক্রমণ করায়, মুফতে পাওয়া এই টাকা পাকিস্তান অস্ত্র কেনার জন্য ব্যবহার করেছে। কারণ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষকে লন্ডনে অস্ত্র কেনার জন্য পাঠিয়ে দিলো। সমস্ত ভারতে অধিবাসীদের এই মানসিক বিচলতায় এক প্রাক্তন স্বংয়সেবক কর্মীর আততায়ীর গুলিতে গাঁধী ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে দিল্লীর সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় প্রাণ হারান।

তার সুদীর্ঘ বিচার চলার পর শ্রী নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের ফাঁসি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এই ঘটনার আগে ২২ জানুয়ারি মহাত্মার প্রার্থনা সভায় জীবন হানিকর আঘাত এসেছিল। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাকে দেহরক্ষী নিতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু গাঁধিজী উহা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে গডসে নিজেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তখনকার শাসক কংগ্রেস এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তা বিচার পদ্ধতিতে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনাটি ঘটেছিলো ৩০ জানুয়ারি। তার তিনদিনের মধ্যেই সর্দার বল্লভভাই ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ কে বেআইনী ঘোষিত করেন। ওই হত্যা মামলায় বিনায়ক দামোদর সাভারকরের উপর ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা চলছিলো, কিন্তু "সন্দেহের অবকাশে" (Benefit of doub't) ছাড়া পান এই মামলা থেকে। গোরক্ষপুরের মন্দিরের পুরোহিত গডসেকে এই আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করেছিল। কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তবে এটা ঠিক যে নাথুরাম গড়্সে এই হত্যার আগে গোরক্ষপুর মন্দিরে কুলদেবতার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য গিয়েছিলেন। ঘটনার পরিহাস এই যে আজ গোরক্ষপুর মন্দিরের সেবাইত যোগী আদিত্যনাথ এই ভারতের উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন।

কাশ্মীর নাটকের চতুর্থ কুশীলব শেখ মহম্মদ আবদুল্লা। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি। সেই সময়ে কাশ্মীর উপত্যকায় তাঁর মতো শিক্ষিত কেউ ছিল না। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে স্বরাজ্যে সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন কিন্তু অচিরেই নীতিভ্রষ্টতার অভিযোগে পদচ্যুত হন তিনি। এরপর ত্রিশের দশকে প্রথমে তিনি রাজনীতিতে যোগদেন। তিনি প্রথমত স্যার মহম্মদ ইকবালের রাজনৈতিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামিল হলেন। তিনি তাহার রাজনৈতিক জিগির হলো বৃটিশদের দ্বারা প্রবর্তিত ১৮৪৬-এর অমৃতসর চুক্তি রদ করা। উক্ত ধারায় ডোগড়া শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে সমান নাগরিক অধিকারের (Uniform Civil Code) কথা স্বীকার। এখানে একটা কথা মুসলমানরা বিশেষত যেখানে রাজনীতির স্পর্শ আছে সেখানেই মুসলিম মৌলভীরা ধর্মীয় ব্যাপারটা টেনে আনে। নাগরিক অধিকার মোটামুটি পাঁচটি বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে, সেগুলি হল-

বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোষ, পোষ্য গ্রহণ ও উত্তরাধিকার সূত্র। এখানে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৩৭ সালে বৃটিশরা মুসলিম পার্সনাল ল বোর্ডের মতো মৌলভীরা এই পাঁচটি ব্যাপারে সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে। অথচ স্বাধীনতার পরেই ১৯৫২ নেহেরুজীর সরকার হিন্দু কোড বিল লোকসভায় পাস করান। কিন্তু নেহেরুর দল ও সরকার মুসলীম নাগরিক অধিকারকে আইনের আওতায় আনার সাহস পায়নি মুসলিম ভোট হারাবার ভয়ে। যখনই এই সব ব্যাপারে নিম্ন আদালতে যেত, উচ্চতর ন্যায়ালয়ে কেউ মামলা করতে সাহস পেত না। নেহেরুজী শেষে হিন্দু কোড বিল পাস করায় হিন্দু ব্রাহ্মণ লবি চটে যায় কারণ তাতে হিন্দু সমাজপতিদের আধিপত্য কিছুটা কমেছিল বৈকী। এই মুসলমিদের তিন তালাক সম্বন্ধে আমরা পরে আসবো। ১৯৩২ সালে শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম কনফারেন্স। পরে আব্দুল গফুর খান ও নেহেরুর পরামর্শে প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করে রাখেন ন্যাশনাল কনফারেন্স। নেহেরুর পরামর্শের কারণ ছিল ন্যাশনাল নাম দিলে তার দল ভারতীয় রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসবে। তার সুন্দর মুখশ্রী, অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, নিপুণ অভিনয়, সর্বোপরি কোরান শরীফে অসাধারণ অধিকার যা সুললিত কণ্ঠে প্রয়োজনে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর বক্তৃতায় পারদর্শিতা অনেকটা ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন-এর মতো এবং বৈদেশিক মন্ত্রী মোহাম্মদ করিম চাগলার সঙ্গে তুলনীয়। সংবাদমাধ্যম বলছে ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন বিশ্ব সাধারণ সভায় একাধিক্রমে সাড়ে ছয় ঘণ্টা বক্তৃতা করেছিলেন। এছাড়া তার মহারাজা বিরোধী আন্দোলনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন পাঞ্জাবের মজলিসই-অহর নামে এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং চোরা পথে বৃটিশ সরকার। শ্রীনগরের বৃটিশ রেজিমেন্ট ও দিল্লী সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ যে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। বৃটিশ সরকারের হরি সিং বিরোধিতার কারণ লণ্ডন গোল টেবিল বৈঠকে মহারাজ হরি সিং-এর কণ্ঠে জাতীয়তাবাদের সুর।

ত্রিশের দশকে মহারাজা বিরোধী এই সব আন্দোলনের জেরে মহারাজা রাজ্যের সংবিধান সংস্কারের জন্য গ্লাসী কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রায়ে শেখ আবদুল্লার হাতে কিছু ক্ষমতাও গেলো। ফলে শেখ আবুদুল্লা যেমন উপত্যকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননেতা হয়ে উঠলেন তেমনই মুসলিম কনফারেন্স কাশ্মীরের জাতীয় দলে পরিণত হলো। মহারাজা বিরোধী আন্দোলনের সূত্রে ভারতীয় সংবাদপত্রের নজরেও পড়লেন। শেখ আবদুল্লার সম্বন্ধে উৎসাহ দেখাতে শুরু করলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও। এই সময় সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের দলের সভাপতি ছিলেন খান আব্দুল গফফর খাঁ। যাকে ভারতের পক্ষ থেকে ভারতরত্ন সম্মানে বিভূষিত করা হয়। যিনি পরবর্তীকালে দিল্লীতে অন্তিম শয্যায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তাঁকে পরে এয়ার এম্বুলেন্সে তাঁর দেশ পেশোয়ারে পাঠানো হয়েছিল। তিনি

শেখ আবুদল্লাকে পরামর্শ দিলেন জনগণের ব্যাপক সমর্থন সংগ্রহের জন্য মুসলিম কনফারেন্সের নাম পাল্টে ন্যাশন্যাল কনফারেন্স করতে। যুক্তি দেখালেন যে রাজ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তা মুসলমানের হাতেই যাবে। সুতরাং মুসলিমের পরিবর্তে ন্যাশনাল লিখলে কিছু ক্ষতি হবে না। শেখ আবদুল্লা ১৯৩৭ সালে দলের সাইনবোর্ড পাল্টে অমুসলিমদের জন্যও উন্মোচিত করে দিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের দুয়ার। এর ফলে ন্যাশনাল কনফারেন্স হয়ে উঠল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহযোগী আর শেখ আবদুল্লা হলেন একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী।

কাশ্মীর উপত্যকার নেতা শেখ আবদুল্লা স্বাভাবিক কারণে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা কাশ্মীরি পণ্ডিত জহরলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠলো বন্ধুত্ব। কারণ দু'জনের সাদৃশ্য প্রচুর। কাশ্মীর ও মুসলমান দুটি শব্দতেই প্রচণ্ড দুর্বলতা জওহরলালের। শেখ আবদুল্লার ক্ষমতার উৎস আবার কাশ্মীরি পণ্ডিত বংশই। শেখ আবদুল্লা প্রয়োজন মতো বন্ধুত্বের অভিনয় করে যেতে লাগলেন। যদিও আত্মজীবনীতে (তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম Flame of Chinar) তাঁর অভিমত "তাদের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে উপরে উঠতে হবে। ত্যাগ করতে হবে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা। জওহরলালের শেখ আবদুল্লার আকর্ষণের আরেকটা কারণ মহারাজা হরি সিং। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন মহারাজা হরি সিং (কথায় বলে না, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, কেবল উলু খাগড়ার প্রাণ যায়)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেসী নেতারা যখন কারাগারের অন্তরালে তখন শেখ আবদুল্লা কমিউনিষ্টদের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ট হয়ে উঠলেন। ফলে তার মুসলীম শরীরে একটু প্রগতিবাদের নামাবলীও বেষ্টিত হলো। কংগ্রেসীরা যখন "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন চালাচ্ছে তখন শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এই আন্দোলন শতবর্ষ পূর্বেকার (১৮৪৬ সালের) অমৃতসর চুক্তির বিরোধী। শেখ আবদুল্লা ডোগরা আধিপত্য মানতে রাজী নন। এই আন্দোলনের জেরে ১৯৪৬ সালে শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পেলেন ভারতের স্বাধীনতার পরে।

শেখ আবদুল্লা সমস্ত স্বপ্ন কেবলমাত্র কাশ্মীর উপত্যকাকে কেন্দ্র করে রচিত। রাজ্যের অন্য অংশ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। বৃহত্তর ভারতের কথা দূরস্থান। জম্মু ও লাডাখকে কাশ্মীর রাজ্য থেকে বিচ্যুত হতে দিতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। জওহরলাল তাঁকে জাতীয় নেতা হিসেবে অভিক্ষেপিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেখ আবদুল্লা দিল্লী আসতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র ও দৌহিত্র ওমর আবদুল্লা দিল্লীতে আস্তানা গেড়েছেন। ওমর আবদুল্লা মুখমন্ত্রী থাকাকালীন অবস্থায় দিল্লীতে সরকারি বাংলো নেন। ওই বাড়িতে তাঁহার বিবাহ বিচ্ছিন্না স্ত্রী থাকেন। ভারতের সব ব্যাপারেই ওমর বক্তব্য রাখেন কিন্তু ওমর নিজের সংসারই সামলাতে পারেন না। জিন্নাও তাকে প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি।

কারণ শেখ আবদুল্লা জানতেন কাশ্মীর পাকিস্তানে গেলে পাক-সেনারা কাশ্মীরের পাঞ্জাবী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন তাঁকে হয় পাঞ্জাবীদের গোলাম হতে হবে, না হয় বেছে নিতে হবে নির্বাসন বা কারাবাস। তার চেয়ে ঢের (উল্লেখ্য পাকিস্তানে চারটি প্রদেশের মধ্যে পাকিস্তানী পাঞ্জাবী সেনারাই পুরোপুরি পাকিস্তানের সবই প্রশাসনিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করে) ভালো তোষণবাদী জওহরলাল ও গাঁধীজির নিরাপদ আশ্রয়।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে মূলত রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর ইঙ্গিতে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে তিনি জিন্নার ভক্ত হয়ে ওঠেন।

উর্দু ভাষায় আত্মজীবনীতে জিন্নার প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে জিন্নার মনোবল ও দৃঢ়তা কংগ্রেসী নেতাদের চেয়ে পরিমাণে বেশী ছিল। দেশভাগের আগে যখন দিল্লীতে জিন্নার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তখন জিন্না তাকে বলেছিলেন "তিনি তাহার পিতার মতো। তাহার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে হিন্দুদের বিশ্বাস করা যায় না। তুমি যদি তাদের বন্ধু বলে মনে করো তাহলে একসময় অনুতাপ করতে হবে। তাদের সমাজে তোমার স্থান নেই।"

জওহরলালের প্রতি শেখ আব্দুল্লার যতটা ভক্তি ছিলো, প্যাটেলের প্রতি ছিলো ঠিক ততটাই বিরাগ। আত্মজীবনীতে জওহরলাল ও প্যাটেলের তুলনা করেছেন তিনি। প্যাটেলের প্রতি বিরাগের মূল কারণ অবশ্যই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধি সম্বন্ধে প্যাটেলের সঠিক উপলব্ধি। প্যাটেল বুঝতেন শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। শেখ আব্দুল্লার আত্মজীবনী অনুসারে জওহরলালের উপস্থিতিতে ১৯৫০ সালেই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন, কাশ্মীর জুয়াতে আমরা হেরে গেছি। এখন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নাটকের মঞ্চ ও কাশ্মীর রাজ্য ঃ- মহাভারতের কাশ্যপ মুনির নামে এই ভূ-খণ্ড। প্রায় পাঁচ শো বছর পর ১৭৯৯ সালে মহারাজা রণজিৎ সিংহ কাশ্মীর দখল করে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটায়। কাশ্মীর উপত্যকার ধর্মান্তরিত মুসলিম অধিবাসীরা সমবেতভাবে তদানীন্তন হিন্দু রাজার কাছে আবেদন জানিয়েছিল হিন্দুসমাজে ফিরে আসার জন্য। সেই শুভ সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি, বারাণসীর নির্বোধ পুরোহিতমণ্ডলীর দ্বারা সেই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগেকার ঘটনা।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের ১৭৯৯ সালে সাড়ে পাঁচশো বছরের ইসলামী শাসনের অবসান ঘটিয়ে কাশ্মীর দখল করেন। ১৮৩৪ সালে রণজিৎ সিংহের ডোগরা সেনাপতি গুলাব সিং লাদাখ জয় করে কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। ১৮৪০ সালে গুলাব সিং জয় করেন বালতিস্থান। কিন্তু ১৮৪৩ সালে রণজিৎ সিংহের পুত্র শের সিং-এর মৃত্যু হলে বিপর্যয় নেমে আসে শিখ সাম্রাজ্যে। অসংবদ্ধ শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয় করতে থাকে বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদ। বিভিন্ন যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ১৮৪৬ সালে (অমৃতসর চুক্তি) ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এই চুক্তি অনুযায়ী ইংরজেরা কাশ্মীর উপত্যকা ৭৫ লক্ষ টাকায় গুলাব সিংহকে বিক্রী করে দেয় এবং গুলাব সিংকে মেনে নেয় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের রাজা হিসেবে। খরিদ সূত্রে কাশ্মীর উপত্যকা অধিকার করার পরে গুলাব সিং রাজ্যের এলাকা দাঁড়ায় (১) জায়গীর পাওয়া জম্মুরাজ্য (২) জয় করা লাডাক ও বালতিস্থান (৩) ক্রয় করা কাশ্মীর উপত্যকা। একটা কথা মনে রাখা দরকার, এই সমস্ত এলাকা ছিল প্রথমে আফগানদের হাতে পরবর্তী সময়ে মুঘলদের হাতে। মুঘল সম্রাটদের কাছে জম্মু ও কাশ্মীর বিশেষ ভ্রমণের প্রমোদ উদ্যান ছিলো। তাই তাঁরা ছয় ছয়টি মুঘল গার্ডেন্স তৈরী করেছিলেন।

এখনও কিছু বাকী আছে। ১৮৯০ সালে ডোগরা শাসক প্রতাপ সিংহ গিলগিট জয় করলে বর্তমান জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা চূড়ান্তভাবে স্থির হয়। অবশ্য ভৌগোলিক ও সামাজিক বিচারে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছয়টি সুনির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলো হলো ডোগরাদের বাসভূমি জম্মু, লাদাখ বা ছোট তিব্বত, বালতিস্থান, গিলগিট, ঝিলাম নদী বরাবর পাঞ্জাবী অঞ্চল আর পড়ে থাকে মুজফরাবাদ ও মীরপূর এবং কেন্দ্রে অবস্থিত পর্বত বেষ্টিত ভূস্বর্গ কাশ্মীর বা কাশ্মীর উপত্যকা। একটা কথা মনে রাখা দরকার মুজাফরাবাদ-মীরপুর বালতিস্থান, ও গিলগিট দখলীকৃত কাশ্মীরের বতর্মানে 'পাক কাশ্মীর' (Pak Kashmir)-এর হস্তগত। ১৯২৬ সালে অপুত্রক অবস্থায় প্রতাপ সিংহ স্বেচ্ছাবসর করলে ইংরেজরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরি সিংকে জম্মু ও কাশ্মীরের সিংহাসনে বসায়।

কাশ্মীর রাজ্য প্রথম থেকেই স্বাধীন ছিল না। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতো কাশ্মীর ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অধিরাজ্য। সবচেয়ে বড় অধিরাজ্য। আয়তন ৮৪৭১ বর্গমাইল। (অবিভক্ত বঙ্গদেশ ছিল ৮২,০০০ বর্গমাইল আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলে) বড় শুধু আকারেই নয়, প্রতিরক্ষার গুরুত্ব দিয়েও। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা পাকিস্তান, চীন ও আফগানিস্তান ও ভারতের সঙ্গে। শ্রীনগর বিমান বন্দর পৃথিবীর উচ্চতম বিমান বন্দর। এই উপত্যকায় আরও বড় ধরনের বিমান বন্দর সম্ভব। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচারে কাশ্মীরের অবস্থান বহুজনের কাছেই ঈর্ষণীয় বলে পরিগণিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবী নেতা সৈয়দ আহমেদ বেরেলীর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিলো একটি ইসলামী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। পাঠকরা আজকের সিরিয়া ইরাকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মারফত ইসলামিক স্টেটের নমুনা দেখতে পাচ্ছেন)। ফলে বাকী ভারত জয় করা তাদের পক্ষে সহজ হতো। পরবর্তীকালেও মুসলমানরা বারবার কাশ্মীর দখলের চেষ্টা চালিয়েছিলো। আজকের যুগেও মায়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের ২৪,০০০ নাগরিক আজ জম্মুতে আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমান ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের ভারতে শরণার্থী হিসাবে অনুপ্রবেশ আটকিয়ে ঠিক কাজ করেছে। যদিও মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তাদের প্রতি উদারতা দেখায়। চেষ্টা করেছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ব্যানার্জীর এ বিষয়ে যথেষ্ট মদত ছিলো দিল্লীর "আপ" ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী প্রশান্তভূষণ এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছিলো এবং কলকাতার বুকে বামপন্থীরা মিছিল পর্যন্ত করেছিলো।

কাশ্মীর যুদ্ধ ঃ- ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব ছাড়াও ছিল প্রায় ৫শো দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যগুলি বৃটিশ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতো। বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতার পাশাপাশি ব্রিটেন এই রাজ্যগুলিকেও স্বাধীনতা দিয়েছিল। এই সব রাজ্যগুলিকে বলা হতো করদ ও মিত্র রাজ্য। ভৌগোলিক সুবিধা মতো ভারত বা পাকিস্তান যে কোনও একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। ভারতের রাজনীতি কুশলী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় তিনটি রাজ্য ব্যতীত সবকটি রাজ্যকেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে রইলো তিনটি রাজ্য যথা- জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় মুসলিম শাসিত রাজ্য হলেও অধিকাংশ প্রজা হিন্দু এবং রাজ্য দুটি ভারত ইউনিয়নের দ্বারা বেষ্টিত। অবশ্য হায়দ্রাবাদের নিজাম খুবই সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সে তার প্রধানমন্ত্রী মীরলায়েক আলিকে রাষ্ট্রসংঘে এটা তোলার জন্য ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছিলো এবং অবশ্য জেনারেল চৌধুরীর নেতৃত্বে তাড়াতাড়ি ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পক্ষান্তরে কাশ্মীরের অধিকাংশ প্রজা মুসলমান হলেও রাজা হিন্দু এবং রাজ্যটি ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের সংলগ্ন। প্রকৃতপক্ষে দেশ বিভাগের ফলে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন। বৃটিশ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ভারত বা পাকিস্তান যে কোনও একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় শ্রীনগর দরবারে কিছুদিনের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখার চুক্তি সম্পাদনা করতে চেয়েছিলো দুই রাষ্ট্রের সঙ্গেই। পাকিস্তান এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। কিন্তু ভারতে এই প্রস্তাব এসে পৌঁছল অক্টোবর মাসে, গণ্ডগোল আরম্ভ হওয়ার অনেক পরে, তার কারণ জম্মু কাশ্মীরের ডাক ও তার ব্যবস্থা ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট সার্কেলের অধীন। কারণ ভারত-ভাগ্যবিধাতা মূঢ় জওহরলালের বিশ্বাস ছিল ভারত বিভাগ একটি ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান। বস্তুত পক্ষে ভারত সরকার কাশ্মীরের ভবিষৎ নিয়ে কোনওরকম ভাবনা চিন্তাই করেনি। জওহরলালের ধরাণা ছিলো জনগণের ইচ্ছায় দু'টি রাষ্ট্র আবার এক হয়ে যাবে।

জওহরলাল কিন্তু ওই সময় জানতেন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের একটা কিছু মতলব আছে এবং অর্থের বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু জমি লীজ দেওয়ার জন্য কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে পাকিস্তান।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর বিনা পাকিস্তান পরিকল্পনাই ব্যর্থ। (কারণ মুসলীম লীগের জিগির ছিলো পাঞ্জাব, কাশ্মীর, বালুচিস্তান, বাংলা, আসাম তার মাঝে ঘোর পাকিস্থান, এখান 'ক' মানে করে কাশ্মীর) পাকিস্তানের নয়া শাসকরা গোড়া থেকেই কাশ্মীর অধিকারের জন্য তৎপর ছিলেন। ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ডাক বিভাগের কর্মচারীরা জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত পোস্ট অফিসেই উড্ডিন ছিল পাকিস্তানি পতাকা। জিন্না ও লিয়াকৎ আলি খান মহারাজ হরি সিংকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্য দিলেন এক ত্রিমুখী পরিকল্পনা। এই তিনটি মুখ হলো অর্থনৈতিক অবরোধ, এজেন্টদের মারফত কাশ্মীরের মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং শেষতঃ বাইরে থেকে সশস্ত্র অভিযান।

কাশ্মীরের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগের সমস্ত পথই ছিল পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে। জম্মু ও শিয়ালকোটের মধ্যে ছিলো রেল ও সড়ক যোগাযোগ। শ্রীনগর ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যে শুধু মোটর পথ। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে পার্বত্য এলাকায় মোটর পথ বহু পর্বত পাহাড়ি এলাকা ঘুরে এবং শীতকালে তা বরফাকীর্ণ। (যদিও বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের মধ্য দিয়ে কতকগুলি সুড়ঙ্গপথ তৈরী করেছেন এবং একটি সুড়ঙ্গ পথ তো পৃথিবীর দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ পথ) ওই রাজ্যে নুন, চিনি, কাপড়, ডাল, আটা, কেরোসিন, পেট্রোল সবই আসতো রাওয়ালপিণ্ডির বাজার থেকে। (করাচী সমুদ্র বন্দর হওয়া স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই রাওয়ালপিণ্ডি পাকিস্তানের রাজধানী হয়ে যায়। জিন্না পাকিস্তানের সিংহাসনে আরোহণ করেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে দিলেন। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে ধুঁকতে লাগলো গোটা রাজ্য। এজেন্টদের মারফত (রাজাকার বাহিনী, আনসার বাহিনী, যাহা পূর্ববঙ্গেও বিশেষভাবে সক্রিয় থাকতো) কাশ্মীর মুসলমানদের উত্তেজিত করা হতে লাগলো উপত্যকায় কর্নেল আদাল খাঁ, জম্মুতে মিয়া আব্দুল রশীদ, বারামুলা জেলায় চৌধুরী ফয়জুল্লা উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে লোক ক্ষেপাতে লাগলেন। পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্রও পাচার করাতে লাগলেন।

এই সমস্ত চক্রান্তের কথা কাশ্মীরের মুসলমানদের কাছে একেবারে অজানা ছিল না। শ্রীনগর শহরে এক নামজাদা চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ এস. কে. অত্রি। বিশ বছর আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে ভাগ্যান্বষণে শ্রীনগরে এসেছিলেন তিনি। একদিন তাঁর চিকিৎসাধীন কয়েকজন সহৃদয় বয়স্ক মুসলমান এসে তাকে বললেন, সপরিবারে কাশ্মীর ছেড়ে চলে যান। পাকিস্তান যে কোনওদিন কাশ্মীর আক্রমণ করবে। তখন কোনও হিন্দু রক্ষা পাবে না।

রাজ্যের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি শ্রীনগর দরবারের নজর এড়ায়নি। প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজন ১৮ অক্টোবর সমস্ত পরিস্থিতি চিঠিতে জানিয়ে লিখলেন জিন্নাকে। চিঠিতে জিন্নার শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে মহাজন লিখলেন আপনি বিষয়টি নিজে দেখবেন। যে উপদ্রব চলছে তা আপনি থামিয়েও দেবেন।

মেহের চাঁদের পত্র পেয়েই ২০ অক্টোবরে উত্তর দিলেন জিন্না। আশ্বাস দিলেন পাকিস্তান ও কাশ্মীর সরকারের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসে সব বিরোধের মীমাংসা করে ফেলবেন। জিন্না তার প্রাইভেট সেক্রেটারী খুরসিদকে এই উদ্দেশ্যে শ্রীনগরে পাঠিয়েও দিলেন।

মহারাজা হরি সিংকে এইভাবে প্রতারণা করে ২১ অক্টোবর থেকে শুরু হলো পাক অভিযান। (এবোটাবাদ হলো সেই জায়গা যেখানে বুশ প্রশাসন ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করেছিলো।) হাজারা জেলায় পাঁচ হাজার উপজাতিকে জেহাদের ধূয়া তুলে অভিযানে সমবেত করা হয়েছিলো। তাদের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র। জেহাদ পরিচালনা করার ক্ষমতা পাকিস্তান ফৌজের মেজর জেনারেল আকবর খাঁর। তিনি জেনারেল তারিক এই ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। অতীতে স্পেন বিজয়ী বীর মুসলমানটির নামও ছিলো তারিক।

আকবর খাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের আরও অনেক সামরিক অফিসার ছিলো। তারা যে সদলে কাশ্মীরে যাচ্ছেন সে কথা পাকিস্থান সরকার মহারাজ হরি সিংকে জানিয়ে ছিলো। ২১ অক্টোবর পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, এদের পরিবারগুলো কাশ্মীরে রয়েছে। তাদের নিরাপত্তার জন্য কাশ্মীরে যাচ্ছেন।

এদিকে পাঠান উপজাতিদের পেছনে রইল পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্য। নেতৃত্বে একজন সেনাপতি। সুতরাং পেশাদারী তৎপরতায় শ্রীনগরের দিকে চললো হানাদাররা। জম্মু ও কাশ্মীরের সেনাদলের চতুর্থ ব্যাটেলিয়ানের অধিপতি কর্নেল নারায়ণ সিং নিহত হলেন তাঁর তাঁবুতে। তাঁরই সৈন্যদলের মুললিম সৈন্যের দ্বারা। ফলে হানাদাররা সহজেই পার হয়ে গেলো মুজাফরাবাদের কাছে কৃষ্ণগঙ্গা নদী। ডোমেলের কাছে ঝিলাম নদী পেরিয়ে দ্রুত গতিতে পর্বত বেষ্টিত কাশ্মীর উপত্যকার দিকে। উরি সেকটরে নিজের প্রাণ দিয়ে হানাদারদের কয়েকদিন দমিয়ে রাখতে পারলেন কাশ্মিরী সেনাদলের ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং। অন্যত্র হানাদাররা যেখানেই গেলো শেখ আবদুল্লার চেলারা পাকিস্তানি পতাকা উচিয়ে অভ্যর্থনা জানালো তাদের। ব্যতিক্রম শুধু মকবুল শেরওয়ানী। বারমুলাতে তিনি প্রচণ্ড বাধা দিলেন পাক হানাদারদের। ফলে হানাদাররা বারমুলা অধিকার করে প্রচণ্ড অত্যাচার চালালো স্থানীয় অধিবাসীদের উপর যার থেকে বাদ যায়নি মুসলীম নারী ও শিশু। বারমূলা থেকে শ্রীনগর মোটে পঞ্চাশ মাইল। কায়েদে আজম্ জিন্না সেবারের ইদুজ্জোহা শ্রীনগরেই পালন করতে চান এহেন জিন্নাকে ভারতের প্রাক্তন উপ-প্রধান মন্ত্রী শ্রীলাল্ কৃষ্ণ আদবানী তার পাকিস্তা সফরের সময় জিন্নাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। এবং তার সেই বক্তব্য লিখে দিয়েছিলেন সুধীন্দ্র কুলকার্নি।

এবার দিল্লীর দিকে ফেরা যাক্। পনেরোই আগস্টের পর কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে জওহরলাল কাশ্মীর সরকারকে উপদেশ দিলেন শেখ আবদুল্লাকে মুক্তিদিয়ে তারই হস্তে অস্থায়ী-সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করতে। শেখ আব্দুল্লাই নতুন সরকার নির্বাচনের

জন্য ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু ২৫শে অক্টোবর দিল্লীতে সংবাদ এলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দলবদ্ধ সশস্ত্র পাঠান উপজাতিরা কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে শ্রীনগরের দিকে। ঘটনার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করে পরদিন সকালে প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠক বসলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো কাশ্মীরে সেনা পাঠানো হবে। গভর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন কাশ্মীরের আংশিক ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন। কিন্তু জওহরলাল ও প্যাটেল দুজনেই এ ব্যাপারে কোনও গুরুত্ব আরোপ করলেন না। জওহরলাল কাশ্মীর দরবারকে নির্দেশ দিলেন শেখ আবদুল্লাকে প্রতিরোধ যুদ্ধে সামিল করতে। কিন্তু শেখ আবদুল্লা সে সময় রাজ্যেই ছিলেন না। ছিলেন ইন্দোরে শ্বশুরবাড়ীতে। পরের দিন মেহের চাঁদ অনুরোধ করলেন আকাশপথে ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরে পাঠাতে। অন্যথা শ্রীনগরে অবরুদ্ধ লক্ষাধিক হিন্দু নরনারীকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না। উল্লেখ্য এই সময়ে বহু উদ্বাস্তু শ্রীনগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না।

২৫ তারিখ মহারাজা হরি সিং ভারত সরকারের নিকট অবিলম্বে সৈন্য সাহায্য চেয়ে SOS পাঠান। ২৫ অক্টোবর সকালে মন্ত্রী সভার Defence Committe -র সভায় মহারাজার আবেদন বিবেচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করলেই সামরিক সাহায্য পাঠানো হবে। মহারাজার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্থল ও বিমান বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব V.P. Menon শ্রীনগরে যান।

সামরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। মহারাজা হরি সিং অসহায়। তিনি কখনও ভাবেন নি যে তাঁর মুসলিম সৈন্যরা হিন্দু সেনাদের হত্যা করে পাকবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং। তিনি মহারাজকে তাঁর জীবনপণ করে যতক্ষণ সম্ভব তিনি হানাদার বাহিনীর গতিরোধ করবেন। আক্রমণকারীরা বারমুলার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। মাত্র ১৫০ জন হিন্দু সৈন্য নিয়ে তিনি উরিতে হানাদার বাহিনীর সম্মুখীন হন। দু'দিন উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই হয়। রাজেন্দ্র সিং উরি সেতু ধ্বংস করলে শত্রুর অগ্রগতি সাময়িক রুদ্ধ হয়। শত্রু সংখ্যা কয়েক হাজার। অসম যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং ও তাঁর সৈন্যরা সকলেই নিহত হন। দুর্জয় সাহস ও অসীম বীরত্বের জন্য V.P. Menon তাহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন— পারস্যের বিরুদ্ধে থার্মোপাইলের যুদ্ধে লিওনাইড ও তার ৩০০ গ্রীক সৈন্যের ন্যায় ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং ও তার সৈন্যরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই বীর সৈনিককে প্রথম মরণোত্তর "মহাবীর চক্র" উপাধি প্রদান করা হলে তা হবে খুবই সঙ্গত।

শ্রীমেনন শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকে মেহের চাঁদ মহাজনকে সঙ্গে নিয়ে মহারাজার প্রাসাদে যান। শ্রীমেনন তাকে দিল্লীর সিদ্ধান্ত জানালে মহারাজা নিঃশর্তে ভারতে যোগদানে সম্মত হন। পাকবাহিনী রাজধানীর উপকণ্ঠে। মহারাজ ও তাহার পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন।

শ্রীমেনন তাকে হিন্দু গরিষ্ঠ জম্মুতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ২৬ অক্টোবর প্রত্যুষেই শ্রীনগর ত্যাগ করেন।

শ্রীনগর থেকে জম্মু দীর্ঘ পথ। ১৭ ঘন্টা একটানা যাত্রা শেষে মহারাজা ক্লান্ত, শ্রান্ত। শয়ন কক্ষে যাওয়ার আগে তিনি AD বললেন– যদি VP Menon দিল্লী থেকে ফিরে আসেন তবেই আমাকে জানাবে। কারণ তা হলে বুঝব ভারত আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। আর যদি ভোরের আলোর আগে তিনি না আসেন তবে আর কিছু আশা নেই। সেক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমার এই রিভলবার দিয়ে আমাকে হত্যা করবে।

দিল্লীতে কি হচ্ছে তখন ঃ- দিল্লীতে বিমান বন্দর থেকে মেনন Defence Committe-র মিটিং-এ যান। তিনি মাউন্ট ব্যাটেনকে জানান মহারাজা ভারতে যোগদানে সম্মত। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে হলে এখনই সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন। মাউন্টব্যাটেন বলেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেনা পাঠানো উচিত হবে না। তিনি আরও বলেন কাশ্মীরের জনসাধারণের পরিপ্রেক্ষিতে এই অন্তর্ভূক্তি হবে শর্তসাপেক্ষ। হানাদার বিতারণ করে রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পর গণভোটের মাধ্যমে বিষযটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। পন্ডিত নেহেরু ও অন্যান্য মন্ত্রীরা বিনা প্রতিবাদে এই প্রস্তাবে সহমত হন।

গাঁধিজীও কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার পক্ষে। তিনি জওহরলালকে বললেন, অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে কাশ্মীরে শান্তি আনা যাবে না। ২৬ অক্টোবরে আবার বসলো প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠক। কান্ডজ্ঞানহীন জওহরলাল কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে রাজী না হলেও বেঁকে বসলেন। তখন সর্দার প্যাটেল ও শেখ আবদুল্লা জওহরলালকে বোঝালেন তাঁর পন্থা সঠিক নয়। পাকিস্তানের আক্রমণে কোতল হয়ে যাবে রাজ্যের সমস্ত হিন্দু নরনারী। শেখ আবদুল্লার চিন্তা স্বাধীন পাক কাশ্মীরে তার দায় নেই।

২৬ অক্টোবরের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বৈঠক ঃ- বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন ও সেনাবাহিনীর প্রধান কাশ্মীরে সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে মত দিলেন। কিন্তু প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ সহ অন্য মন্ত্রীরা জোরালো বক্তব্য রাখলেন সেনা পাঠানোর পক্ষে। অগত্যা রাজী হতে হলো কুচক্রী-মাউন্টব্যাটেনকে। কিন্তু তিনি প্রস্তাব রাখলেন সেনা পাঠানোর পক্ষে।

ইতিমধ্যে ২৫ অক্টোবর মহারাজ হরি সিং শ্রীনগর হিন্দুদের রক্ষার ভার শ্রীনগরের দয়ানন্দ এঙ্গলো ভেদিক কলেজের তরুণ অধ্যাপক বলরাজ মাধোকের উপর ভার ন্যস্ত করে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি ফেলে নেমে এসেছেন।

তার ২ দিনের মধ্যে সাতাশে অক্টোবর প্রভাতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর তিনটা ডাকোটা বিমান কর্নেল রণজিৎ রায়-এর নেতৃত্বে একশো পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে অবতরণ করলো শ্রীনগরে মহারাজার বিমান ক্ষেত্রে। সৈন্যদের নামিয়ে দিয়ে বিমান তিনটি ফিরে গেল পুনরায় সৈন্য আনার তাগিদে। আগেই বলেছি হানাদাররা রাজেন্দ্র সিংকে নিধন করে বারমুলার দিকে

এগিয়ে আসছে। কর্নেল রায়-এর নেতৃত্বে কয়েকশ ভারতীয় সেনা বারমূলার দিকে। ছত্রিশ ঘন্টা যুদ্ধ করে বীর গতি প্রাপ্ত হলেন কর্নেল রণজিৎ রায়। এর মধ্যে দেড় হাজার সৈন্য এসে পৌছেছেন ভারতীয় সেনা শ্রীনগর বিমান বন্দরে। কর্নেল রায়-এর স্থলাভিসিক্ত হলেন ব্রিগেডিয়ার লাওনেল প্রতীপ সেন, সাফল্যের মুখ দেখতে লাগলো ভারতীয় সেনা বাহিনী।

শেখ আব্দুল্লা কাশ্মীরে ফিরে এলেন সাতাশে অক্টোবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গেই। শ্রীনগর ফিরে প্রথম বক্তৃতায় তিনি জানালেন-আমরা ধূলা থেকে উদ্ধার করেছি কাশ্মীরের মুকুট, আমরা হিন্দুস্থানে যোগ দেবো না পাকিস্তানে সেটা আমাদের আসল সমস্যা নয়, প্রথমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। দীর্ঘ ভাষণে তিনি একবারও উল্লেখ করলেন না ভারত সরকার বা ভারতের সাহসী সৈন্যদলের কথা।

কিন্তু শ্রীনগর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল তাঁর ঝাল মেটাতে চাইলেন মহারাজ হরি সিং এর উপর। তাঁর একবারও মনে পড়লো না লন্ডন গোল টেবিল বৈঠকে মহারাজ হরি সিং-এর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থনের কথা। তাঁর ক্রুদ্ধ মনে ব্যক্তিগত সমীকরণ। পূর্বতন অপমানের প্রতিশোধ।

বছর খানেক আগেকার কথা। ১৯৪৬ সালের কথা। তখন ভারতে এসেছেন স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স মিশন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সরজমিনে তদন্ত করার জন্য। ওই মিশনে তিনি জনসদস্য ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর পলিকল্পনা নিয়ে কথা চলছে সিমলাতে। মোটামুটি ঠিক,জওহরলাল হচ্ছেন স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু সে সময় শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরের কারাগারের আবদ্ধ অমৃতসর চুক্তি বিরোধী আন্দোলনের জেরে সে আন্দোলনের একমাত্র ধ্বনি, ডোগরা মহারাজা কাশ্মীর ছাড়ো। উপত্যকার মুসলমানেরা ত্রিশের দশক থেকে অমৃতসর চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে। কাশ্মিরী উৎসবে কবি ইকবাল লিখেছিলেন-

হে বাতাস তুমি যদি জেনেভার উপর দিয়ে প্রবাহিত হও
তাহলে লীগ অফ নেশনকে সেই বার্ত্তা পৌছে দাও
ওরা কৃষক শস্য, নদী আর বাগিচা বিক্রি করে দিয়েছে
এক কথায় একটি পুরো জাতিকে, তাও অতি সস্তায়।

জওহরলালের প্রিয় কমরেড কারান্তরালে (অর্থাৎ শেখ তখন জেলে)। তিনি কি সিমলায় চুপচাপ বসে থাকতে পারেন? ছুটলেন তিনি শ্রীনগরের দিকে। জওহরলালের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাকের পরামর্শে কোহালা সীমান্তে তাঁকে আটকালো কাশ্মীর সরকার। জানানো হলো, তাঁর কাশ্মীরে প্রবেশ নিষেধ। জওহরলাল স্বভাবতই মানলেন না এই রাজাদেশ। কাশ্মীরে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার বরণ করলেন তিনি।

এর মধ্যে জামানা একটু পাল্টেছে। ১৯৪৭ সালের শেষভাগে ভ্রান্ত সেকুলারবাদে বিশ্বাসী নেহেরুজী কাশ্মীর সরকারকে নির্দেশ দিলেন, গোটা কাশ্মীর রাজ্যের শাসনভার শেখ আবদুল্লাকে

অর্পণ করতে। বলরাজ মাধোক এই ব্যবস্থার মৃদু প্রতিবাদ রাখলেন প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহারাজের কাছে। মহারাজ বললেন, শেখ আবদুল্লা ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা নেবার জন্য এগিয়ে আসছে না। বস্তুতঃ জম্মু ও লাদাখবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কোন রাজনৈতিক দলই ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরকে ইজারা দিয়েছিল ন্যাশনাল কনফারেন্সের কাছে। চরিত্রগতভাবে ওটা একটি মুসলিম সাম্প্রদায়িক। জম্মুতে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ একটি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা। বলরাজ মাধোক ১৯৪৭ সালের প্রথম থেকেই জম্মুতে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এই উদ্দেশে তিনি রচনা করেছিলেন একটি দলীয় সংবিধান কিন্তু নানা কারণে দল গঠন করা হয়নি।

এদিকে শেখ আবদুল্লা শুধু কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতাই দখল করলেন না, যুদ্ধ প্রক্রিয়ার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকাকে এক সপ্তাহের মধ্যে হানাদার মুক্ত করেছিল। এরপর ভারতীয় বাহিনীর উচিৎ ছিলো পাঞ্জাবী ভাষী মুজফরবাদের দিকে ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের দিকে।

কাশ্মীরে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনা যে শৌর্য্য ও বীরত্ব প্রদান করেছে, যুদ্ধের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এর কারণ ৪টি - (১) সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের এটাই প্রথম যুদ্ধচালনা (২) কাশ্মীর উপত্যকা পর্বত সঙ্কুল হওয়ায় সমতলের সেনাদের কাছে দুর্লঙ্ঘ (৩) যুদ্ধের সময়টা শীতকাল (৪) ভারতের প্রয়োগোচিত (Stratigic support) খুবই সামান্য ছিল। কারণ দখলদারী পূর্ব থেকে সমরাস্ত্র নিয়ে সুসজ্জিত ছিল (যেমনটা দেখা গেছিল ১৯৪৬ সালের Great Calcutta Killings - জিন্নার Direct Action Day- কোনটা Direct আর কোনটা Action)।

কিন্তু মুসলিম সেনারা যদি ধর্ষণ, হত্যা ও লুণ্ঠনে না মত্ত হতো, তবে শ্রীনগরের পতন হয়তো রোধ করা যেত না। এই সময়কার যুদ্ধে মুজাফরাবাদের ও বারমূলায় একটি প্রবল বেষ্টনী তৈরী করেছিলো। শ্রীনগর মাত্র ৩০ মাইল। লেঃ কর্নেল দেওয়ান রণজিত রায় নিহত হওয়ায় মুষ্টিমেয় ভারতীয় সেনা ছত্রভঙ্গ। শ্রীনগরের পথ বাধাহীন। কিন্তু পাক বাহিনী রাজধানীর পথে অগ্রসর না হয়ে আক্রমণ করে বারমুলার মিশনারী কনভেন্ট- Franciscan Missionaries of Mary- পাঠান সৈন্যরা তৃপ্ত করে ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের মজ্জাগত অতৃপ্ত বাসনা। বলা যায় They violated the nuns, massacred the patients in there little clinic, looted the convent chapel down– to its' last brass door knob.'এভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায় মহম্মদ আলি জিন্নার কাশ্মীর বিজয়ের স্বপ্ন।

পূর্বে দেখেছি ৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানে দাঙ্গার পর জলস্রোতের মতো উদ্বাস্তু দিল্লীতে আসে। সদ্য আসা স্বজন হারা! সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মনে

হয়েছে হত্যা ও অত্যাচারের ভয়ংকর স্মৃতি। তদুপরি দিল্লীর মুসলমানদের প্ররোচনামূলক বিবৃতি পরিস্থিতিকে করে তোলে অগ্নিগর্ভ। পন্ডিত নেহেরু লর্ড মাউন্ডব্যাটেনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তার হাতে অর্পণ করেন সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব। লর্ড মাউন্ডব্যাটেন আর শুধু নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল নন- তিনি হলেন কার্যত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসক (Chief executive) এবং লর্ড মাউন্ডব্যাটেন নবলব্ধ ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ক্ষমতা হস্তান্তর চুক্তি অথবা Instrument of Accession এ জনগণের ইচ্ছা বা মতামতের কোনও সংস্থান নেই। সংযুক্তির সঙ্গে গণভোট (এবং পরবর্তীকালে ৩৭০ ধারা) যুক্ত করে কাশ্মীর সমস্যাকে স্থায়ী ও আন্তর্জাতিক রূপ দিয়ে জিনিসটাকে জটিল করা হয়েছে।

দেশ ভাগের পর জিন্নার ধারণা হয়েছিল, কাশ্মীর যখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন এই দেশীয় রাজ্যটির পাকিস্তানে যোগদান নিশ্চিত। তিনি দু 'সপ্তাহ কাশ্মীর অবকাশ যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। (এটা দিল্লীর মুঘল সম্রাটদের কাশ্মীরে শালিমার গার্ডেন্স উপভোগ করার মতো মুঘলরা কাশ্মীরে ৬টি গার্ডেন তৈরী করেছিল)। মহারাজা হরি সিং আপত্তি জানান, ক্ষুদ্ধ হন মহম্মদ আলি জিন্না (বলা ভালো পাকিস্তান সরকার মুম্বাই-এর জিন্নার বাড়িতে একটি জিন্না সংগ্রহশালা তৈরী করতে চেয়েছিলো কিন্তু ভারত সরকার তাতে রাজী হয়নি) বাড়িটির আনুমানিক বাজার মূল্য ২০০ কোটি টাকা।) এই ব্যাপারে ক্ষুদ্ধ হন মহম্মদ আলি জিন্না, কারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণে মত্ত না হয়ে পাক বাহিনী যদি শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হতো তবে ২/৩ দিনের মধ্যে মহারাজা হরি সিং-এর পরাজয় (সাময়িক হলেও) ছিল অনিবার্য। জিন্না তাঁর একান্ত সচিব খুরশীদ আনোয়ারকে গোপনে শ্রীনগরে পাঠান। এই আশায় যে যদি রাজার তথা রাজধানীর পতন হয় বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্বে মহম্মদ আলী জিন্না কাশ্মীর প্রবেশ করবেন। সেই আয়োজন করার জন্যই খুরশীদ আনোয়ার শ্রীনগরে অবস্থান করছিলেন। ভাগ্য প্রতিকূল। অধৈর্য জিন্না লাহোরে বিজয়বার্তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী খুরশীদ আনোয়ারকে বন্দী করে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়। যে মুহূর্তে জিন্না জানতে পারেন যে শ্রীনগর ভারতে যোগদান করেছে এবং শ্রীনগর ভারতীয় সেনার অধীন তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সেনাধ্যক্ষ জেঃ গ্রেসী। General Gracey)-কে অবিলম্বে কাশ্মীরে পাঠাবার নির্দেশ দেন। সেনাধ্যক্ষ (Supreme Commander) Field Marshal Achinlek-এর সম্মতি ব্যতীত তিনি সৈন্য পাঠাতে পারেন নি। (এখানে বলে রাখা ভালো যে F. M. Achinlek-ছিলেন ভারত পাকিস্থান উভয় দেশেরই Supreme Commander-বৃটিশরা এই যৌথ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন)। F.M. Achinlek-জিন্নাকে জানিয়ে দেন যে কাশ্মীর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। পাকসেনা কাশ্মীরে প্রবেশ করলে- পাকবাহিনীতে কর্মরত সকল ইংরাজ অফিসারদের প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই হুশিয়ারীর তাৎপর্য বুঝতে জিন্নার বিলম্ব হয়নি । তিনি অতঃপর কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য লর্ড মাউন্ডব্যাটেন ও

পন্ডিত নেহেরুকে লাহোর আমন্ত্রণ জানান। (এখানে বলে রাখা ভালো, রাওয়ালপিণ্ডি তখনও তৈরী হয়নি)। জিন্নার সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একান্ত আগ্রহী। কিন্তু প্রবল আপত্তি তোলেন সর্দার প্যাটেল। প্যাটেল বলেন পাকিস্তান যখন আক্রমণকারী তখন ভারত তোষণের জন্য পাকিস্তানে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্যাটেলকে সমর্থন করেন তার সচিব ভি. পি. মেননও। বিরোধ যখন তুঙ্গে নেহেরু ও প্যাটেলের মধ্যে তখন মধ্যস্থতা করতে মহাত্মা গাঁধী শেষ পর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্ত নেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন একাই যাবেন লাহোরে।

মীরপুর, কোটলী, পুঞ্জে ভারতীয় সেনার গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছিলো। উল্লেখ্য অনেক গোলাবারুদ ও সৈন্য সমতল ভূমি থেকে পাঠানো হচ্ছিল। তখন যদি ভারতীয় বাহিনীকে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করতে দেওয়া হতো তাহলে এইসব অঞ্চল অচিরেই হানাদার মুক্ত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। জওহরলালের নির্দেশে সেনাবাহিনীর কথা শুনতে হতো। শেখ আবদুল্লা ওই সব অঞ্চল হানাদার মুক্ত করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না। বলরাজ মাধোক যখন জম্মু এলাকার সেনাপতি পরাঞ্জপেকে বললেন মীরপুর, কোটলী, ভীমবার শহরে সরবরাহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কারণ ওই সব অঞ্চলে বহু হাজার হাজার হিন্দু অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তখন পরাঞ্জপে জানালেন তাকে শেখ আব্দুল্লার নির্দেশ মানতে হয়। তিনি প্রস্তাব দিলেন এ ব্যাপারে জওহরলালের সঙ্গে আলাপ কর। জওহরলাল ১৫ নভেম্বর জম্মুতে আসলেন। বলরাজ মাধোক জম্মুতে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাকে মীরপুর ও কোটালী শোচনীয় অবস্থার কথা জানালেন। এবং অনুরোধ করলেন ভারতীয় সেনা পাঠানো হোক। মাধোকের প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ হয়ে দাম্ভিক জওহরলাল তাঁকে নির্দেশ দিলেন শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে দেখা করতে। যদিও মাধোক জানিয়েছিলেন শেখ আব্দুল্লা ওই সব অঞ্চল উদ্ধারের জন্য মোটেই উৎসাহী নন। কয়েক দিনের মধ্যে মীরপুর ও কোটলার পতন ঘটল। ওই অঞ্চলে প্রায় কুড়ি হাজারেরও বেশী হিন্দু কোতল হলো, অপহৃত হলো বহু হাজার হিন্দু রমণী। পাকিস্তান বাহিনী অগ্রসর হলো জম্মুর দিকে। ভীমবার, দেব ,বাতাল ও ঝংগরের পতন ঘটল একের পর এক। এর মধ্যে মূঢ় জওহরলাল ঘোষণা করলেন, পাকিস্থানী হানাদারদের বিতাড়িত করার পরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার জন্য গণভোট নেওয়া হবে। ফলে ভারতভুক্তির ব্যাপারটা তাৎকালীন ও শর্তসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ালো। মূঢ়তার এখানেই শেষ নয়। কুচক্রী মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে জওহরলাল ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি জাতিসংঘে জানালেন পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।

এ-সব ঘটনায় দারুণভাবে হতাশ হয়ে উঠলেন মহারাজা হরি সিং। ৩১ জানুয়ারি তিনি এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন সর্দার প্যাটেলকে। রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার বিশদ বর্ণনার পরে তিনি জানালেন আমার পক্ষে সম্ভাব্য বিকল্প হচ্ছে ভারতভুক্তি প্রত্যাহার করা। তা হলে

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আদালতে তোলা মামলার অপমৃত্যু ঘটবে। কারণ তখন আর ভারতের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে কথা বলার কোনও ভিত্তি থাকবে না। ফল হবে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া। তাহলে যে অসুবিধা সেটা হলো ভারতীয় বাহিনী সাহায্যকারী "স্বেচ্ছাসৈন্য" হিসেবেই কাশ্মীরে থাকতে পারবে। আমি আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্ব নিতে প্রস্তুত। বর্তমান অবরুদ্ধ জীবনে আমি হতাশ। অসহায় দেশবাসীর বুকভাঙ্গা কষ্ট দেখার চেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয়। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আমি ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতাদের আচরণে সুখী নই। তারা হিন্দু ও শিখেরদের সঙ্গে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি, এমনকি বহু সংখ্যক মুসলমানেরও। শেষে লিখলেন কাশ্মীরের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অনেক সংহত। যখন বরফ গলে যাবে তখন চতুর্দিক থেকেই পাকিস্থান আক্রমণ শানাবে। লাডাখও পাকিস্তানের কব্জায় চলে যাবে।

মহারাজ হরিসিং এর চিঠিতে কিছু ফল হলো, ব্যবস্থা নেওয়া হলো হানাদারদের কবল থেকে লাডাখকে রক্ষা করার জন্য। দখলে রাখা হলো কারগিল তহশীল, যে কারগিল তহশীল দিয়ে চলে গেছে শ্রীনগর লে-লাদাখ সড়ক। কিন্তু গিলগিট, বালতিস্তান, মীরপুর-মুজাফরাবাদ বলয় উদ্ধারের কোনও চেষ্টাই করা হলো না। মীরপুর, মুজাফরাবাদ বলয় উদ্ধার খুব দুরোহ ছিল না। প্রকৃত ভাবে এটা উদ্ধার করতে দেওয়াই হয়নি। কাশ্মীর উপত্যকার বাইরে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দখলের ব্যাপারে শেখ আবদুল্লার কোনও উৎসাহই ছিলো না।

জওহরলালের মূঢ়তা ও দূরদৃষ্টির অভাব তো ছিলই। ১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি মহারাজা হরি সিংকে লিখেছিলেন, "আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিরক্ষার মাধ্যমে গোটা ভারতও পৃথিবীর কাছে প্রদর্শন করবে কীভাবে অসাম্প্রদায়িকভাবে সংহতির সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম, কাশ্মীরের এই উৎকট সমস্যা এইভাবে গোটা ভারতের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারবে।"

স্বাধীন কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখা আবদুল্লার স্বার্থ, জম্মু ও কাশ্মীরের হিন্দুদের জান-মান সম্পত্তি বাঁচানোর স্বার্থ ও মিল্লাত পন্থী মুসলমানদের স্বার্থ একখাতে প্রবাহিত হতে পারে না, তা এই মূঢ় নেতার বোধগম্য ছিল না।

এর মধ্যে এক অদ্ভুত কাজ করলেন গাঁধিজী। যে মানুষ মাত্রই আড়াই মাস আগে অন্যায়ের কাছে মাথা না হওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন এবং কাশ্মিরী হানাদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনিও বেঁকে বসলেন জওহরলালের মন্ত্রীসভায় এক যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ১ নভেম্বরে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও লর্ড ইসমে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখ্য আধিকারিক লাহোরে জিন্নার সঙ্গে দেখা করেন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে গণভোটের প্রস্তাব করেন। জিন্নার দাবি উভয় রাষ্ট্রে গভর্নর জেনারেলের উদ্যোগে হোক গণভোট। ব্যর্থ হয় প্রথম কাশ্মীর বৈঠক।

২ নভেম্বরে পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণে বলেন "রাজ্যে আইনের শাসন ও শান্তি

প্রতিষ্ঠার পর কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট তিনি তা করতে প্রস্তুত।"

সর্দার প্যাটেল ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলদেব সিং ৩ নভেম্বর শ্রীনগরে কাশ্মীর রণাঙ্গণের সেনাধ্যক্ষ বিগ্রেডিয়ার এল. পি. সেনের সঙ্গে সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। মেজর কুলবন্ত সিংকে (জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য গঠিত নতুন ডিভিশনের জন্য গঠিত) অবিলম্বে বারমূলা দখল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বারমূলা হল কাশ্মীরের রাজধানীর প্রবেশদ্বার। প্রবল যুদ্ধের পর ৮ নভেম্বরের ভারতীয় বাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করে। পাক সেনাদের বর্বর অত্যাচারে এই ক্ষুদ্র শহরটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। লোকসংখ্যা ছিল ১৪০০০। নির্বিচারে হত্যা লুণ্ঠন ও ধর্ষণের পর অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১০০০। মহিলা নেই একজনও (বিদেশী সাংবাদিকের সাক্ষাতে জানা যায় মুসলিম সেনারা বারমূলায় লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও হত্যার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলো তার সঙ্গে দিল্লীতে নাদির শাহীর বর্বরতা তুলনীয়।

ভারতীয় বাহিনীর রথ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে। অপ্রতিরোধ্য তার গতি! পাক বাহিনী ছত্রভঙ্গ। সব ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। ১১ নভেম্বরে ভারত বিনা যুদ্ধে দখল করে উরি সেক্টর। অবশ্য ২০১৫ সালে ভারত পাকিস্তানে Uri Surgical Strike করেছিল পাঠানকোটের বদলা হিসেবে। এই কথা উল্লেখনীয় যে মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং ছয় মাস কাশ্মীর সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন পরে তিনি Chief of General Staff নিযুক্ত হন। এই পদে উন্নীত হওয়ার পর তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য দুইটি আলাদা ডিভিশন গঠন করেন। এই ডিভিশনগুলে তে আসেন জেনারেল কে. এস. থিমায়া এবং মেজর জেনারেল আত্মা সিং, যিনি পরে পুঞ্চ দখল করেন।

সামরিক ইতিহাসে এই প্রথম কাশ্মীর যুদ্ধকে জওয়ানদের যুদ্ধ যা Battle of Jawans নামে খ্যাত। অনেক সময় এক ইঞ্চি পরিমাণ জমি দখল করতে সেনাদের মরণপণ লড়াই করতে হয়েছে।

কিন্তু রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য। ১৯৪৭ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি হয় দিল্লিতে। এই চুক্তিতে ঠিক হয়।

(ক) যুদ্ধবিরতি ও কাশ্মীর ছেড়ে আসার জন্য আজাদ কাশ্মীর সেনাবাহিনীদের রাজী করাতে পাকিস্তান সরকার সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে।

(খ) অতঃপর রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থাপনায় গণভোটের জন্য উভয় সরকার (পাকিস্তান ও ভারত) রাষ্ট্রসংঘের নিকট আবেদন করবে।

চুক্তিপত্রের কালি শুকোবার পূর্বেই লিয়াকত আলীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় জেহাদের আহ্বান, দিল্লী থেকে করাচী ফিরে গিয়ে তিনি দলে দলে কাশ্মীর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য মুসলিম

ভাইদের কাছে আবেদন জানান। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তান কাশ্মীর ত্যাগ করবে না। এই ঘটনায় ভারত সরকারের মনোভাব কিঞ্চিৎ কঠোর হয়। পাকিস্তানের এই দ্বি-চারিতাও প্রকাশ্য বৈরীতায় নেহেরুর অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

নেহেরু-লিয়াকত আলোচনা ব্যর্থ হলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন গাঁধী এবং নেহেরুকে বলেন কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হওয়া। তীব্র আপত্তি জানান মন্ত্রী সভার সদস্যগণ। ১৯৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভারত সরকারীভাবে কাশ্মীরে গণভোটের জন্য আবেদন জানান। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিযুক্ত কমিশন নয়াদিল্লী ও করাচী পরিদর্শন করেন। উভয় সরকারই গণভোট করানোর প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত সরকার মনে করে এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন। ভারত উদ্যোগে Sri Roy Bucher-কে নির্দেশ দেন যে পাক সেনাধ্যক্ষ Sir Doughlas Gracey-কে জানিয়ে দেওয়া হউক যে পাকিস্তান রাজী হলে ভারত যুদ্ধ বিরতি চায়। ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি মধ্যরাত্রি থেকে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। নেহেরু সরকারের এই সিদ্ধান্তে কাশ্মীর সেনাঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। কারণ প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। এর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত কাজ করলেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বেঁকে বসলেন জওহরলাল মন্ত্রীসভায় এক যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। বিভাজনের সময় সম্পদের বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ৫৫ কোটী পাওনা ছিল ভারতের কাছে। কারণ ওই টাকায় সমরাস্ত্র কিনে পাকিস্তান যুদ্ধ তীব্র করে তুলবে। সর্দার প্যাটেল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এক পয়সাও দেব না।

গাধীজির শেষ অনশন ঃ- মাউন্টাব্যাটেন স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রীসভায় এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। গাঁধীজি বললেন, ব্যাপারটা রাজনীতি কুশলতার পরিচয় নয় এবং ভুল সিদ্ধান্ত। স্বাধীন সরকারের প্রথম অসম্মানজনক কাজের জন্য গাঁধিজী ১৩ জানুয়ারি থেকে আমরণ অনশনে বসলেন। উদ্দেশ্য ভারতের জনগণের বিবেক জাগ্রত করার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতি করা। (বলা ভালো ভারতের সাবালক জনগণ তাদের কোনও পরিণত মাপের বুদ্ধি নেই, তাদের সবকিছু দেখিয়ে কিংবা শিখিয়ে দিতে হবে।) ভারতের আমজনতাকে তিনি "স্কুল" ছাত্রের মতো বিচার ব্যবস্থা চলার ক্ষমতা নেই।

সুতরাং আবার মন্ত্রীসভাকে বৈঠকে বসতে হলো। গাঁধীজির জীবন রক্ষা করার জন্য পাকিস্তানের পাওনা টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো বৈঠকে। পাঁচদিন পরে অনশন প্রত্যাহার করলেন গাঁধীজি। পাকিস্তান টাকা পেয়ে নব উদ্যমে নেমে পড়লো কাশ্মীর রণাঙ্গণে। পাকিস্তানের নিয়মিত সৈন্যের পুরো দুই ডিভিশন লড়তে লাগলো কাশ্মীরে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই গাঁধীজির মৃত্যু ডেকে আনলো। ক্রুদ্ধ এক মারাঠীর গুলিতে নিহত হলেন তিনি।

এদিকে গুপ্ত হত্যাকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ২৭ নভেম্বর বলরাজ মাধোক চলে

এলেন জম্মুতে। এসে দেখলেন নতুন দল গঠনের কাজ কিছু এগোয়নি। তিনি জম্মুর নিজস্ব দল প্রজা পরিষদ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। প্রজা পরিষদ দাবী করলো জম্মুর স্বশাসন। সেই সঙ্গে প্রজা পরিষদের হাতে জম্মুর ক্ষমতা অর্পণ। শেখ আব্দুল্লা তখন জওহরলালের বলে বলীয়ান। জম্মু পরিষদকে তার শত্রু ভাবতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাড়না করতে আরম্ভ করলেন প্রজা পরিষদের সদস্যদের।

ইতিমধ্যে গাঁধীজি নিহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে চললো পুলিশী ধরপাকড় ও নিষিদ্ধকরণ। নিষিদ্ধ হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (৪ঠ ফেব্রুয়ারি-১৯৪৮) সুযোগ পেয়ে গেল শেখ আব্দুল্লাএবং প্রজা পরিষদের নেতা প্রেমনাথ ডোগড়া কারারুদ্ধ হলেন। নিষিদ্ধ করলেন বলরাজ মাধোকের কাশ্মীরে প্রবেশ। স্বাধীনতার পরে বৃটিশ সরকারের কালা কানুনগুলো যথা নিবর্তমূলক আইন (Preventive Detention Act) কোনও নাগরিক অন্যায় করতে পারেন এই অনুমান থেকে সেই নাগরিক অনুমান পূর্বক জেলে অন্তরীণ করে রাখা, কোর্টে তাকে উপস্থাপন না করা। অর্থাৎ বন্দী জানলো না কি তার অপরাধ। শুধু সন্দেহের ধারণায় দিনের পর দিন জেলবন্দী রাখা।

প্রেমনাথ ডেগরা ও প্রজা পরিষদের নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জম্মুর স্বশানের দাবীতে জম্মুবাসীরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। শত শত জম্মুবাসী নরনারী গ্রেপ্তার বরণ করলেন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। এই আন্দোলন দমন করার জন্য নির্মম অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করলেন আব্দুল্লা সরকার। স্ত্রীলোকদেরও রেহাই দেওয়া হল না। তাদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালানো হলো। এই ট্র্যাডিশন এখনও সমানে চলছে।

জম্মুর এই অশান্তি জওহরলাল নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। অবশিষ্ট ভারত জম্মুবাসীর নিপীড়ন সম্বন্ধে অজ্ঞই ছিল। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে জম্মুর একদল নরনারী দিল্লীতে এসেছিলেন ভারত সরকারের কাছে তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য। মন্ত্রী হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সবকিছু শুনে দুঃখবোধ করলেও তাঁর কিছু করার ছিল না। তিনি তাদের জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দিলেন। তারা যে নেহেরুর সাক্ষাৎ চেয়েছিলো তা পরবর্তীকালে নেহেরু অস্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ভারত সরকারের রেসিডেন্ট কানওয়ার দলীপ সিং দিল্লী এসে জানানেল শেখ আব্দুল্লা স্বেচ্ছাচারী। তিনি ভারত সরকারের নীতি বা পরিকল্পনা মানতে রাজী নন। ভারত সরকার দলীপ সিং-এর কথায় কর্ণপাত না করায় পদত্যাগ করলেন। যেহেতু জওহরলাল নিজেই কাশ্মীরের ব্যাপারটা দেখছিলেন। সেহেতু শ্যামাপ্রসাদ বা প্যাটেল এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি।

১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে প্রেমনাথ ডোগরা মুক্তি লাভ করলেন। প্রজা পরিষদকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করতে বাধা দেওয়া হবে না। এই মর্মে আশ্বাস দিলে প্রজা পরিষদ তার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল।

তারপর এক অদ্ভুত কাজ করলেন জওহরলাল। কাশ্মীর যুদ্ধ যখন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, আর কয়েক মাস যুদ্ধ করলেই সমস্ত হানাদাররা গোটা কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হবে, এমন সময় ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী আকস্মিকভাবে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করলেন তিনি। এ সম্পর্কে জওহরলালের চাটুকার ঐতিহাসিক ডা. সর্বপল্লী লিখেছেন যে, জওহরলালের কাছে যে চিন্তা অন্য সব চিন্তা থেকে অগ্রাধিকার তা হলো পাকিস্তান নেতাদের ভয় থেকে মুক্ত করা। তারা ভাবতেন ভারত পাকিস্তান জয় করে নেবে। যুদ্ধ বিরতি তাদের সেই ভয় থেকে দূর করতে সক্ষম। তখন লিয়াকত আলি খান লণ্ডনে। তার হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল ভীত সন্ত্রস্ত।

এই যুদ্ধ বিরতির সময় কাশ্মীরের প্রায় অর্দ্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই পাল্টা আক্রমণ করে এগিয়ে চলেছে। সামরিক অবস্থা অনুকূলে বলেছেন শ্রী ভি. পি. মেনন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র সংঘের নিকট গণভোটের আবেদন প্রথম পাকিস্তান করেনি, করেছে ভারত। যুদ্ধ বিরতির উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্থান নয় ভারত।

শত্রু পলায়ন নিশ্চিত। তখন বিজয়ী শক্তি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এরকম ঘটনা যুদ্ধের ইতিহাসে নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই পবর্ত প্রমাণ ভ্রান্তি কী অজ্ঞতা প্রসূত। (এইরকম ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় পলাশী প্রান্তরে যখন মীরজাফর ক্লাইভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে) সবাই তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন। কিন্তু শেখ আব্দুল্লা তার নিজের লক্ষ্যে অবিচল (ইদানীং কালে আব্দুল্লা পুত্র ও দৌহিত্র সমান তালে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা দু'জন হুরিয়তের নেতার সঙ্গে বহুত মাখামাখি করেন। সঙ্গে দোসর পি. চিদম্বরম ও মণিশঙ্কর আইয়ার) নিজ লক্ষ্য পূরণের তাগিদে তিনি ক্রমাগত দোষারোপ করতে লাগল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগ ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে কাশ্মীর স্বাধীন, ভারত সরকার অযথা কাশ্মীরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।

১৯৫০ সালের ১০ জুলাই আব্দুল্লা এক চিঠিতে ব্ল্যাকমেল করলেন জওহরলালকে। চল্লিশ লাখ কাশ্মীরির ভাগ্যবিধাতা হিসাবে আমি তাদের অধিকার ও সুবিধাসমূহ বিসর্জন দিতে পারি না। আমি বহুবার বলেছি পাকিস্তানের প্রতি আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা ভারতে যোগ দিয়েছি। কারণ আমরা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার দুটি উজ্জ্বল উদাহরণদেখেছিলাম গাঁধিজী ও আপনি। পাকিস্তানের প্রতি আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিইনি। কারণ আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কার্যক্রম তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখন যদি আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় যে আমাদের রাজ্যকে আমাদের নিজেদের মতো করে গড়ে তুলতে পারব না, তাহলে আমাদের দেশের লোকদের কী বলবো? আমরা কি করেই বা তাদের মুখোমুখি হবো?

সুতরাং কাশ্মীরে যুদ্ধ বিরতি হলেও, তার ধারা চালু হলেও শান্তি ফিরে এলো না। কারণ

সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি শর্তাধীন হয়ে রইল। রইল গণভোটের প্রশ্ন। রইলো বহু মুসলিমের পাকিস্তান প্রেম।

গণভোট প্রশ্ন পেন্ডুলামের মতো ঝুলছিল ঃ- এক সময় শেখ আবদুল্লা নিজেই কাশ্মীর উপত্যকাতে গণভোট করতে চেয়েছিলেন। তখন বারমুলার মুসলিম পুরুষ ও নারীদের উপর হানাদারদের অত্যাচারের জন্য সমগ্র কাশ্মীরবাসীরাই পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ ছিলো। কিন্তু তখন জওহরলাল রাজী হননি। এক সময় কাশ্মীর গণপরিষদে আব্দুল্লা নিজেই ভারতভুক্তি চূড়ান্ত করতে চেয়েছিলেন। তখনও তিনি রাজী হননি। কিন্তু বহুবারই তিনি কাশ্মীরবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা স্বীকার করেছেন। (পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম. পার্টি বরাবর দার্জিলিঙের নেপালীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেছেন। কিন্তু সি. পি. এমের রাজত্বে ৩০০ দার্জিলিঙ বাসীর মৃত্যু হয়েছে এই দাবীর আন্দোলনে) সুতরাং কাশ্মীরে গণভোট করতে হবে। ওদিকে হানাদারদের আক্রমণে জম্মুর অনেক অংশই বেদখল হয়ে পড়েছিল। জম্মুর হিন্দুরা আশা করেছিল রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে ভারতভুক্ত হয়ে যাবে এবং ভারত এবং ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা যে ধরনের অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে জম্মুর মানুষেরাও তেমন স্বাধীনতার পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করবে।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীরের নির্বাচন হলো। শেখ আব্দুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স বিপুল ভোটে জয়ী হলো ওই নির্বাচনে। সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলো কাশ্মীরে। কিন্তু এর ফলে শেখ আব্দুল্লার বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো কাশ্মীরে। শেখ আব্দুল্লা ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকাই জাতীয় পতাকার মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে জম্মুর গাঁধী স্মারক কলেজের ছাত্ররা ন্যাশনাল কনফারেন্সের পতাকাকে অভিবাদন করতে অস্বীকার করায় তাদের চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করা হোল।

খণ্ডিত ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব ভি.পি. মেনন তাঁর বইয়ে (The Story of Integration of the Indian States) লিখেছেন ভারত বারংবার উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে (চেঙ্গিস খাঁ, জহিরুদ্দিন মহম্মদ, বাবর, তৈমুর লঙ, নাদির শাহ ও শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন খিলজী যাকে নিয়ে পদ্মাবতী সিনেমার উপাখ্যান।) পাকিস্তান তার জন্মের ২ মাসের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথেই আক্রমণ করেছে কাশ্মীর। মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্য কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে সীমান্ত সুরক্ষিত করার প্রয়োজন। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল বিস্মৃত হয় তার বিনাশ আসন্ন।

শেখ আব্দুলার কথা- Srinagar today, Delhi Tomorrow- (A nation that forgets its history, or geography does it so at its peril.)

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নৈরাশ্যবাদ অহিংসা সত্ত্বেও বিশ্বাসী জৈন ও বৌদ্ধ কিভাবে ভারতীয় জনমানুষকে প্রভাবিত করেছে। এই অহিংসার সম্পর্কে অশোক, রাজধর্মরূপে

গ্রহণ করে। উপেক্ষিত হয় সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা। বৈদেশিক আক্রমণ হয়ে উঠে অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক William Durant তাই যথার্থই বলেছেন হিন্দুরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রহণ করে তাদের উদ্যম ও তেজকে নষ্ট করেছে। জাতিকে করেছে দুর্বল। এই দুর্বলতার সুযোগে শক, হুন, মুসলমানগণ আক্রমণ করেছে ভারত। সহস্র বৎসরের পরাধীনতায় (মুসলিম ৬০০ বৎসর বৃটিশ ২০০ বৎসর সহ) অহিংসার মোহজাল বোধ করি কিঞ্চিত শিথিল হয়। আবির্ভাব ঘটে রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহের মতো বীর যোদ্ধাদের।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী। শান্তি ও অহিংসার নব অবতার। এক লক্ষ্য তাঁর হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য।

যে মুসলমান জাতি শত শত বৎসর ধরে ভারতে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে, রচনা করেছে পৈশাচিক বর্বর নৃশংসতার নব নব অধ্যায়। তার সঙ্গে সম্প্রীতিকে গাঁধী মুক্তির প্রথম শর্তরূপে ঘোষণা করলেন। তার হিন্দু মুসলিম মিলনের শ্লোগান বাস্তবে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে পরিণত হলো। গাঁধী নেহেরুর মুসলিম তোষণনীতির পরিণাম ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল।

পাকিস্তানের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যুদ্ধ হল পাকিস্থান আন্দোলনের অসমাপ্ত অধ্যায়ের অংশ বিশেষ। এইটা নেহেরুজী পূর্ণ করলেন ১৯৪৯ সালে ভীমরাও আম্বেদকরের সংবিধান রচনার সময়। সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এ প্রশাসনিক আদেশ সংযোজন করে। সুতরাং কাশ্মীর বা ভারতের জনগণের স্বার্থে নয় পাকিস্তানের স্বার্থে এবং লিয়াকৎ-এর স্বার্থে যুদ্ধবিরতি।

কয়েকমাস পরেই কাশ্মীরের গণপরিষদের নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রজাপরিষদ উৎসাহী হয়ে উঠলো এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য। যথারীতি তারা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মনোনয়ন জমা দিলো। কিন্তু দেখা গেলো তাদের ঊনষাটটি প্রার্থীর মধ্যে বিয়াল্লিশ জনের মনোনয়ন খেয়াল খুশী মাফিক তুচ্ছ কারণে বাতিল করা হয়েছে। ক্ষোভে প্রজা পরিষদ নির্ব্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল।

শ্যামাপ্রসাদ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানালেন প্রজা পরিষদের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক কুশলতার পরিচায়ক নয়। নির্বাচনে যোগ দিলে অন্তত কয়েকজন তো নির্বাচিত হতে পারতো। কিন্তু প্রজা পরিষদ নেতারা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, ফলে শেখ আব্দুল্লা তার অনুগামীদের নিয়েই পূর্ণ করে ফেললেন, জম্মু কাশ্মীর গণপরিষদ। তারপর তিনি থাবা থেকে বের করতে আরম্ভ করলেন তার ধারালো নখর।

ভারতের গণপরিষদের সদস্য হিসাবে শেখ আব্দুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ সুবিধা চাইলেন। অজুহাত দেখালেন কাশ্মীরী মুসলমানদের তুষ্ট না রাখলে আসন্ন গণভোটের সময় তারা বিগড়ে যেতে পারেন। জহরলালকে হজম করতে হলো এই ব্ল্যাকমেলিং। তৈরী হলো জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় সংবিধানের জন্য বিশেষ ধারা তার নাম ৩৭০ ধারা।

এই ধারায় বলা হলো জম্মু ও কাশ্মীর ভৌগোলিকভাবে ভারতের অংশ কিন্তু প্রতিরক্ষা যোগাযোগ ও বিদেশনীতি বাদে সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে রচিত আইন জম্মু ও কাশ্মীর আইন সভার সম্মতি ব্যতিরেকে ওই রজ্যে প্রযুক্ত হবে না। কিছুদিন আগে সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে গৃহীত জি. এস. টি. আইনও জম্মু-কাশ্মীরে লাগু করতে মেহবুবা মুফতি চালু করতে অস্বীকার করেন (বলে রাখা ভালো মমতা ব্যানার্জীর সরকারও প্রথমে জি. এস. টি. লাগু করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান সভার অধিবেশন ডাকেননি, তবে পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কড়া নির্দেশের পরে অর্ডিন্যান্স করে জি. এস. টি. লাগু করে।

জওহরলাল যখন এই ধারা লিপিবদ্ধ করার জন্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের কাছে পাঠান তখন বাবা সাহেব শেখ আব্দুল্লাকে বলেন, আমি ভারতের স্বার্থ বিসর্জন করে আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভারতের আইনমন্ত্রী হইনি। আপনি কী করে আশা করেন যে ভারত কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা করবে, রাস্তা বানাবে, সেতু তৈরী করবে, মানুষকে খাওয়াবে (ভারত বহু বৎসর জম্মু ও কাশ্মীরের খাদ্য ও রেশনে ভরতুকি দিয়েছে) অথচ তার সেখানে কোনও অধিকার থাকবে না।

জওহরলালের নির্দেশে গোপালস্বামী আয়েঙ্গার (একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ) যিনি জওহরলালের বংশবদ ছিলেন তিনি এই ধারাটি লিপিবদ্ধ করেন (আয়েঙ্গার সংবিধান রচয়িতা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন) তারপর এই সংযোজিত ধারাটি জওহরলালের উদ্যোগে গণপরিষদে পেশ করা ও গৃহীত হয়। আম্বেদকর তীব্র প্রতিবাদ করেন এই ধারার। শেষ পর্যন্ত গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এই ধারাটি সাময়িকভাবে গৃহীত হয়েছে বিবৃতি দিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

মন্ত্রী হিসাবে এই সময় শ্যামাপ্রসাদ তীব্রভাবে এই ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে পারেন নি। কাশ্মীরের ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে জওহরলালের উপর ন্যস্ত ছিলো এবং এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বোঝেন বলে দাবী রাখতেন। ১৯৪৯ সালে ২৬ নভেম্বর ভারতের নতুন সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। পরের বছর ২৬ জানুয়ারি ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওদিকে শুধু ৩৭০ ধারাতেই সন্তুষ্ট হলেন না শেখ আব্দুল্লা। কারণ বহুদিন ধরে যে স্বপ্নটি মনে মনে লালন করেছিলেন সেটি স্বাধীন কাশ্মীরের। সেই ১৯৪৮ সালের প্রথমেই তিনি আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের সঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর ও তার উন্নতির জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলে শ্রীনগরে মার্কিন দূতের সঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনায় তার মনে হয়েছিলো আমেরিকা ও ব্রিটেন দুটি রাষ্ট্রই স্বাধীন কাশ্মীর গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। জমি আগের থেকে প্রস্তুত ছিলো। ১৯৪৯ সালে তিনি কাশ্মীর বিষয়ক মধ্যস্থতা বিচারপতি স্যার ওয়েন ডিক্সনকে ইঙ্গিত দিলেন স্বাধীন কাশ্মীর ব্যাপারে।

এই সমস্ত ঘটনা প্রকাশিত হতে থাকার ফলে সবাই আব্দুল্লা তোষণের জন্য জওহরলালকে কাজের প্রতিবাদে ছাত্ররা ধর্মঘট আরম্ভ করলো। জনমত ছাত্রদের পক্ষে গেলেও, ছাত্র

আন্দোলন পরিণত হলো গণআন্দোলনে। এই আন্দোলনের অজুহাতে শেখ আব্দুল্লা সরকার প্রেমনাথ ডোগরা ও তার সহকর্মীদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। জম্মু শহরে বিরাশি ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হল। (সম্প্রতি গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে দার্জিলিঙ ও কালিম্পং জেলায় ২০৩ দিনের বন্ধ পালন করা হয়েছিল। বোধ হয় সর্বভাতীয় রেকর্ড) ১৯৫২ সালের ২৪ মার্চ শেখ আব্দুল্লার রাজস্বমন্ত্রী মীর্জা অফজল বেগ কাশ্মীর গণপরিষদে বললেন, জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। (অনেকটা সোভিয়েট রিপাবলিকের মতো)। আমাদের লক্ষ্য যে আমরা এমন একটি সংবিধান রচনা করবো, যাতে এই রাষ্ট্র অন্যসব প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুরূপ হতে পারে। আমাদের পরিকল্পনা এই রাজ্যের নিজস্ব রাষ্ট্রপতি, পৃথক জাতীয় পরিষদ ও পৃথক বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা থাকবে।

শেখ আব্দুল্লা এগিয়ে গেলেন আর এক ধাপ, বললেন আমরা সম্পূর্ণভাবে একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। কোনও দেশ আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা দিতে পারবে না। ভারতীয় অথবা কোনও পার্লামেন্টের আমাদের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেই।

এরপর রণবীর সিংহ পুনরায় এক ভাষণে বলেন যতদিন ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ দৃঢ়পদে অধিষ্ঠিত থাকবে, ততদিন জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রস্তাবকে বালসুলভ, অবাস্তব ও উন্মত্তার পরিচয় বলে বর্ণনা করেন। শেখ আব্দুল্লার জওহরলালকে ব্লেকমেল করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তা হলো ভারতের সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলোকে বড় করে প্রচার করা। কিন্তু ভারতেও সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলীর জন্য ভারতের জনগণ একা দায়ী ছিল না। পাকিস্তানের (পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে এবং তার আগে পূর্ববাংলায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেছে) ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় ভারতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি চলছিল।

কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকায় শেখ আব্দুল্লা ও তার সমর্থকরা যা আকাঙ্ক্ষা করেন জম্মুর হিন্দু অধিবাসীরা তার অংশীদার হতে পারে না। তারা স্বাভাবিকভাবে জম্মুর সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি চাইছিলো। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম কিংবা খুলনা জেলা হতে চায়নি। ঐতিহাসিকরা এইসব আন্দোলনেকে বিকৃত করেছেন। যেমন কংগ্রেস নেতা কৃপালনী লিখেছিলেন "১৯৫২ সালের শেষে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিষ্ঠিত জনসংঘ প্রজাপরিষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাশ্মীর সমস্যা, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা, গোহত্যা নিয়ে পাঞ্জাবে ও দিল্লিতে আন্দোলন, তাই এইসব আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ ও প্রজা পরিষদের তিনটি দাবী এক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান। একবিংশ শতাব্দীতে আজও বলা যায় যে এই তিনটি দাবীই ছিল ন্যায্য। শ্রী আচার্য কৃপালনী ও জয়প্রকাশ নারায়ণকে তিনি দলে টানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাহারা নেহেরু ও গাঁধীবাদী কংগ্রেসী, তাই তাহারা এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন না। অবশ্য জয়প্রকাশ তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহার চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন, তার উত্তর ছিল সাম্প্রদায়িকতার

অর্থ এই নয় যে আপনি যে-ভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, সেই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা।

১৯৫১ জুলাই চুক্তি ঃ- জম্মুর আন্দোলনের বিপরীতে জওহরলাল শেখ আব্দুল্লাকে সন্তুষ্ট করতে নতুন করে তার পদ বন্দনা শুরু করলেন। আব্দুল্লার বিচ্ছিন্নতাবাদী সঙ্গীতে জুড়লেন নতুন সুর। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে আব্দুল্লার সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ২৬ জুলাই তিনি চুক্তি পার্লামেন্টে পাস করিয়েও নিলেন। জুলাই-এর এই চুক্তিতে বলা হল– (১) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অধিকার কাশ্মীর রাজ্যের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে।

(২) ভারতের রাষ্ট্রপতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সম্মতি ব্যতিরেকে সেখানে জরুরী অবস্থা জারী করতে পারবে না।

(৩) জম্মু ও কাশ্মীর সরকার নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করতে পারবে।

(৪) রাজ্যের অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক হবে।

(৫) রাজ্যের প্রধান নিযুক্ত হবে রাজ্যের আইন পরিষদের পরামর্শে, তাই ১৯৫৩ সাল অবধি রাজ্যের কোনও রাজ্যপাল নিযুক্ত করা যায়নি। তখন রাজ্যের প্রধানের নাম ছিল (সর্দার-ই-রিয়াসত), শেখ আব্দুল্লা অতিরিক্ত একটি কুকর্ম করতে চেয়েছিলেন। সেটা হলো মহারাজা হরি সিংকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো। সেটি জওহরলালের বাধার জন্য সম্ভব হয়নি। জওহরলাল বুঝেঝিলেন তাতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। (বৃটিশ সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ভারতে যুদ্ধবন্দী হিসাবে বিচার করার কথা চিন্তা করেছিলেন। পরে জনগণের এর উপর প্রতিক্রিয়া কথা ভেবে তাহা পরিত্যাগ করেন।)

জুলাই-এর কালা কানুনের ফলে কাশ্মীর যে ভারতের অঙ্গরাজ্য এ-কথা বলার সুযোগ রইল না। শ্যামাপ্রসাদ আগেই আব্দুল্লাকে জিন্নার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন আব্দুল্লার বিচ্ছিন্নতাবাদ ডান হাতের আস্তিনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, যখন তিনি বাঁ হাত দিয়ে ভারত ভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

জুলাই চুক্তি লোকসভাতে অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হলে শ্যামাপ্রসাদ দুটি প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রথমটি ঃ- পাক অধিকৃত কাশ্মীর কি আমরা ফিরে পাবো? জাতিসংঘের চক্রান্তে আমরা ওই অংশ কোনদিন ফিরে পাবো না (পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই যে রাষ্ট্রসংঘ পরে একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করলেন তিনি "পালা" করে ছয়মাস করে ভারতে এবং পাকিস্তানে থেকে রাষ্ট্রসংঘের কাছে কি রিপোর্ট পাঠাতেন তা আজও অজানা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ- আমি কী প্রশ্ন করতে পারি যে শেখ আব্দুল্লা ভারতীয় সংবিধানে অংশীদার কি না? তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। অথচ তিনি নিজের রাজ্যের জন্য আলাদা ব্যবস্থা চাইছেন। ৪৯৭টি করদ রাজ্য নিয়ে গঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যদি কল্যাণকর হয় তা হলে কাশ্মীরের পক্ষে তা কল্যাণকর হবে না কেন?

জওহরলাল প্রশ্ন দুটির কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। শুধু কাশ্মীরের বিশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আবোল তাবোল কথাবার্তা বলে ও জম্মুর প্রজা পরিষদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে মূল দুটি প্রশ্নকে এড়িয়ে গেলেন। (একটা কথা বলে রাখা ভালো যে তখনকার লোকসভায় কংগ্রেসের দুর্দমনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো। সব বিরোধীদের উপর Steam Roller চালাতেন)। অতিরিক্ত ক্ষমতা পেয়েই শেখ আব্দুল্লা উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। জওহরলালের বাধাদানের জন্য মহারাজ হরি সিংকে নিগৃহীত করতে পারলেন না। তাই ডোগরা মহরাজের পরিবর্তে জম্মুবাসী ডোগরাদের উপর শেখ আব্দুল্লা তাঁর ক্রোধ ও বিদ্বেষ বর্ষণ করতে লাগলেন। এখানে বলি জম্মু অংশ ৫টি জেলা নিয়ে গঠিত। জম্মু, কাঠুয়া, উধমপুর, রিয়াসী ও মীরপুর পূর্বে রাভী আর পশ্চিমে ঝিলম নদী সুন্দরভাবে ঘিরে রেখেছে অঞ্চলটিকে।

আর দক্ষিণে রয়েছে পীরপিঞ্জাল পর্বত মালা। জম্মু-কাশ্মীর শাসনভার পেয়ে শেখ আব্দুল্লা তাঁহার সহকর্মীদের নিযুক্ত করলেন জম্মুর প্রশাসনে। উধমপুর জেলাকে দুভাগে বিভক্ত করা হলো। নতুন জেলাশাসক হয়ে এলেন কুখ্যাত আদালত খাঁ। যারা জম্মুর কেন, গোটা ভারতের উপরই কোনো দরদ ছিল না। সামগ্রিকভাবে জম্মুর শাসনভার ছিলো বক্সী গোলাম মহম্মদের উপর। শেখ আব্দুল্লার জামাতা যাকে শেখ আব্দুল্লা সোহাগ করে "গুল" সাহেব বলে সম্বোধন করতেন এবং যার নামে শ্রীনগরে মস্তবড় স্টেডিয়াম আছে। তিনি সৎ হলেও তাঁর আমলারা ছিল অসৎ। ভারত সরকার জম্মুতে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী পাঠাত, কিন্তু সেগুলি আমলাদের এবং কালোবাজারীদের কারসাজিতে গুদামে চলে যেত।

এই সময় প্রেমনাথ ডোগরা দিল্লিতে এসে সাক্ষাৎ করলেন শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে। এবং শ্যামাপ্রসাদকে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন জম্মুর পরিস্থিতি। তিনি জানালেন, আব্দুল্লার কীর্তিকলাপে জম্মুবাসীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আব্দুল্লা জম্মু ও কাশ্মীরকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করতে চাইছে।

শ্যামাপ্রসাদও ওই ধারণার সঙ্গে একমত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সবকিছু না দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুচিত বলে মনে করে জম্মু ও কাশ্মীর পরিদর্শনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ১৯৫২ সালের ৮ আগস্ট শ্যামাপ্রসাদ জম্মু যাত্রা করলেন। সেখানে তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। শ্যামাপ্রসাদ জম্মুর পরিস্থিতি সচক্ষে দেখলেন এবং সেবিষয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ওদিকে শেখ আব্দুল্লা তার আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করার একদিনের জন্য শ্রীনগরে গেলেন শ্যামাপ্রসাদ। যেখানে ছ'ঘণ্টা ধরে বৈঠক হলো শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে। বৈঠকে জম্মুবাসীদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সহৃদয় বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানালেন আব্দুল্লাকে। কিন্তু অমননীয় আব্দুল্লা জানালেন জম্মুর আন্দোলনকারীদের কোনও জনসমর্থন নেই এবং দাবীগুলির কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৈঠকে শেখ আব্দুল্লাকে শ্যামাপ্রসাদ বললেন, "আপনার নীতি ও বিবৃতি জিন্নার সমগোত্রীয় বলে প্রকাশ পাচ্ছে। শ্যামাপ্রসাদ ফিরে এসে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি জওহরলালকে বোঝালেন পরিস্থিতির গুরুত্ব অস্বীকার করে কোনও লাভ নেই। তিনি বললেন, "প্রজাপরিষদ কতকগুলি অসন্তুষ্ট ও দখল হারানো জমিদারদের দল নয়" । তাদের ব্যাপক জনসমর্থন আছে। দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে হানিকর কোনও প্রস্তাব তাদের উপর চাপাবার চেষ্টা করা হলে তা শেষ পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। শ্যামাপ্রসাদ জওহরলালকে জানালেন, প্রেমনাথ ডোগরার দেশপ্রেম ও ন্যায়পরায়ণতার কোনও অবিশ্বাসের অবকাশ নেই।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, প্রজাপরিষদ, জনসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান জওহরলালের দু'চক্ষের বিষ। সুতরাং জিগরী দোস্ত কমরেড শেখ আব্দুল্লাকে বিরক্ত করে তিনি শ্যামাপ্রসাদের সুপরামর্শ গ্রহণ করবেন কেন?

একটা কথা বলা ভালো, জুলাই চুক্তির একদিকে বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে ঐক্যের প্রস্তাব সন্নিহিত। শেখ আব্দুল্লা বিচ্ছিন্নতার উপাদানগুলিকে শুধুমাত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। তিনি কাশ্মীর গণপরিষদে পৃথক পতাকা ও নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধানের ব্যবস্থা পাস করিয়ে নিলেন। ধামাচাপা দিলেন নাগরিকত্বের সম্প্রসারণ, মৌলিক অধিকার, কাশ্মীরিদের উপর সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত ধারাগুলি। অন্যদিকে কাশ্মীরের সংবিধান রচনা করার জন্য কমিটি নিয়োগ করলেন। সেই কমিটি কাশ্মীরকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার ব্যবস্থা করেছিল।

প্রেমনাথ ডোগরা শেখ আব্দুল্লার আদ্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বিফল হলেন। প্রজাপরিষদের নেতারা এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন 'গণ আন্দোলন ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

তবুও নেতারা এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এই বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ বলে মনে করলেন। ১৯৫২ সালের ৮ই নভেম্বরে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জলন্ধরে দেখা করতে এলেন। জনসঙ্ঘের পাঞ্জাব প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে শ্যামাপ্রসাদ জলন্ধরে এসেছিলেন। প্রেমনাথ শ্যামাপ্রসাদকে জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। বললেন, সেখানকার জনগণের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে আন্দোলন ছাড়া গতি নেই। শ্যামাপ্রসাদের নিজের উপলব্ধি যে যুক্তি তর্ক দিয়ে জওহরলালের মন জয় করা যাবে না। তিনি ধারণার দাস। সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ প্রেমনাথ ডোগরাকে পরামর্শ দিলেন 'যে তিনি ন্যায় বিচার চেয়ে যখন বিফল হয়েছেন তখন তাকে আন্দোলন করতে বাধা দেওয়া হবে না, তবে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বিচার করেই যেন প্রজাপরিষদ আন্দোলনে নামে।'

শ্যামাপ্রসাদ বললেন জনসংঙ্ঘ সর্বদা তাদের সমর্থনে আছে বাকী ভারতও তাদের সপক্ষে জনমত গঠনে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

শ্যামাপ্রসাদ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপরীতে এই প্রথম ও শেষবার গণআন্দোলনের উপযোগিতা স্বীকার করলেন। শুধুমাত্র জওহরলালের মূঢ়তা অহঙ্কারের জন্য।

প্রজা পরিষদ আরম্ভ করলেন তাদের আন্দোলন। আন্দোলনের ধ্বনি, এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান ঃ-

প্রজাপরিষদের আন্দোলনের মুকাবিলা করার জন্য শেখ আব্দুল্লা জওহরলালের নিকট গিয়ে সশস্ত্র রিজার্ভ পুলিশ ও পাঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে কাঁদানে গ্যাস স্কোয়াডের সাহায্য পেলেন। নিপীড়নের মাধ্যমে জম্মুর গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করলেন। গ্রেপ্তার হলো হাজার হাজার লোক। সুপরিকল্পিত আক্রমণ হলো জম্মুর অধিবাসীদের উপর।

তাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও বাজেয়াপ্ত করল, এমনকি স্ত্রীলোকদের উপর বর্বর অত্যাচার হলো, আন্দোলন দমনের পাশাপাশি শেখ আব্দুল্লা তাঁর পারিষদ বৃন্দ এবং জওহরলাল স্বয়ং প্রজাপরিষদের বিরুদ্ধে উত্তেজনাকর ও চরিত্র হননকারী বিবৃতি দিতে লাগলেন।

প্রতিবাদে ১৪ ডিসেম্বর সারা ভারতে জম্মু দিবস পালন করলেন। ফলে জম্মুর ঘটনাবলী সম্পর্কে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো, ডিসেম্বরের (১৯৫২ সালের) শেষের দিকে কানপুরে জনসঙ্ঘের (এই সংগঠন ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়) প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জনসংঘের তরুণ প্রতিনিধিরা দাবী করলেন যে কোনও একটি সময়ের মধ্যে ভারত সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হউক। সরকার এই চরমপত্র অনুসারে কাজ না করলে জনসঙ্ঘ সারা ভারত জুড়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করবেন। (ভাগ্যের কি পরিহাস যে মহাত্মা গাঁধির সত্যাগ্রহ, অনশন, অসহোযোগ আন্দোলন কেউ আর মুখেও উচ্চারণ করে না, এখন হয়েছে ধর্ম্মঘট, অবরোধ, বন্ধের জমানা)।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ বললেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার আগে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করা উচিৎ।

শেষ পর্যন্ত সম্মেলনে স্থির হলো মীমাংসার প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদ জওহরলাল ও শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে পত্রালাপ করবেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি জওহরলালকে ছ'টি এবং শেখ আব্দুল্লাকে ৪টি চিঠি লেখেন। এই চিঠিগুলির মধ্যে শ্যামা প্রসাদের মানবতাবাদ, দেশপ্রেম, রাজনীতি কুশলতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি যাবতীয় গুণ সম্যকভাবে ধরা পড়ে। তুলনায় জওহরলাল ও শেখ আব্দুল্লাকে নিতান্তই একগুঁয়ে ও অহংকারী বলে মনে হবে। চিঠিগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলো। দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশনেতা নিজেদের অভ্রান্ত মনে করে শ্যামাপ্রসাদের আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করেনি। পরবর্তী অধ্যায় চিঠিগুলি পরিবেশিত হলো।

জওহরলাল ও শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক চিঠিগুলি

৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলিকাতা ৯.১.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলালজী,

আমি জম্মুর অবস্থা নিয়ে আপনার সঙ্গে কি পত্রালাপ করতে পারি? ভারতীয় জনসংঘের কানপুর অধিবেশনে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সকলের অসংবাদিত ইচ্ছা, আপনার ও শেখ আব্দুল্লার কাছে ব্যাপারটা নিয়ে সোজাসুজি দরবার করি। আমি জানি আপনি এই প্রসঙ্গে আমার মতো অনেকের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন না। যে পরিস্থিতিতে বর্তমান আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় একটি সমাধানে দ্রুত উপনীত হওয়ার জন্য সর্বতোভাবে আপনি চেষ্টা করবেন।

আন্দোলনটি ছ-সপ্তাহ ধরে চললেও স্তিমিত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এটি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামের ও শহরের মানুষ যাদের অনেকে প্রজাপরিষদের সমর্থক নয় তারাও এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসছে। এবং তাদের প্রতিনিধিদের উপর এই আন্দোলন পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে।

আন্দোলনটি জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরের কিছু রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা কিছু ব্যক্তির দ্বারা প্ররোচিত হচ্ছে একথা বলা ঠিক নয়। বহু লোকের এই আন্দোলনের ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন আছে এবং আমরা এই দাবীগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করি।

আন্দোলনজনিত দুর্ভোগটি এখন পর্যন্ত স্থানীয় মানুষরাই বহন করছে। যারা নিজেদের সামান্য সঙ্গতির উপরই প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল, আন্দোলনের উদ্যোক্তারা হটকারী কাজ করে সমস্যার সৃষ্টি করেছে একথা ঠিক নয়।

সাংবিধানিক উপায়ে এবং আপোষে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রজাপরিষদের নেতারা ও অন্যানরা বারবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আলোচনায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে আপনার কাছে, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে, রাজ্যর মন্ত্রীদের কাছে এবং শেখ আব্দুল্লার কাছে। (নেহেরুজী অস্বীকার করেছেন যে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রতিনিধি দল পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল। এদের অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাতকার চাওয়া হয়েছে, কিন্তু এ-ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই।

বিভিন্ন সময়ে নানা অধিবেশন হয়েছে এবং সুচিন্তিত আলোচনার জন্য প্রজা পরিষদ ও তাদের সমর্থকদের বক্তব্য প্রকাশ করে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। আপাতভাবে কর্তৃপক্ষপক্ষ এই জনমতের প্রকাশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি এবং এমনকি অপমানিত করেছেন। অন্যদিকে যে সমস্ত প্রসঙ্গ অত্যন্ত বিতর্কিত বলে উত্থাপিত করা হয়েছে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গে নিজস্ব

স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করে কর্তৃপক্ষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ, অস্ত্র ব্যবহার ও নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজগুলো দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ব্যাপারগুলিতে যদি তদন্ত করা হয় তবে নিরপেক্ষ বিচারক দিয়েই করা উচিৎ। প্রজাপরিষদের মুখপাত্র ঘোষণা করেছেন যে তাহারা এই ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। নিজেদের উগ্রপন্থার যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই কর্তৃপক্ষ বারংবার আন্দোলনকারীদের উগ্রপন্থা অবলম্বনের অভিযোগ উল্লেখ করেছে।

বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা এক অবিরাম দমনের রাজত্ব দেখেছি। বস্তুতপক্ষে পার্লামেন্টে আপনি এমন কথাও বলেছেন যে ব্যাপারটা আপনার হাতে থাকলে আপনি এর থেকে বেশী বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করতেন। আমাদের কাছে অনেক বিপরীত ধর্মী সংবাদসমূহ এসে পৌঁছেছে। এদিকে সরকারী বিবরণে আন্দোলনের বিস্তার ও দমনপীড়নের গোপন করার প্রয়াস, অন্যদিকে বেসরকারী সূত্র প্রদর্শন করেছে ঘটনাসমূহের একেবারে বিপরীত চিত্র।

প্রায় তেরোশো মানুষের গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ্জ, টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া, গুলিবর্ষণ পর্যাপ্ত পোশাকহীন বন্দীকে শীতল স্থানে স্থানান্তরিত করা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে, যা আন্দোলনের দমন-পীড়নের অবলম্বন করা হয়েছে। দমন-পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না। সেটা উপলব্ধি করার সময় এসেছে আপনার ও শেখ আব্দুল্লার পক্ষে। কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে ভয় ও সন্দেহের এবং সেগুলির যথাযথভাবে প্রতিকার করা উচিৎ। আপনার সাম্প্রতিক কিছু বক্তৃতায় আপনি পরস্পরের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি, সহনশীলতা, বলপ্রয়োগের পরিবর্তে শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে জনগণকে নিয়ে চলার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তথাপি বাস্তব প্রশাসনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সেই পুরাতন পদ্ধতি যা প্রশাসনকে কলঙ্কিত করার কাজে ব্যবহৃত হতো, তারই প্রয়োগ চলছে, এমনকি কখনও কখনও আরও প্রবলভাবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্যাকে কোনও দলীয় দাবী বলে দেখা সঙ্গত নয়। এটি একটি জাতীয় সমস্যা এবং সমবেত ভাবেই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

প্রজাপরিষদের অতীত ইতিহাস উল্লেখ করে প্রায়ই তার বর্তমান দাবীগুলিকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস দেখা যায়। সুস্পষ্ট কারণেই তার বর্তমান দাবীগুলিকে গুণানুযায়ী বিচার করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আমরা যদি একে অপরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলি তাহলে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে যাবে আরও। জম্মুর বহুসংখ্যক মুসলমানও যে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, এই ঘটনা অনুগ্রহ করে উপেক্ষা করবেন না। ভারতের বাকী অংশের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু ভারতের জনগণের এই রাজ্যের ঘটনার সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আমি আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত এই রাজ্যের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে। এর জন্য কারও কোনও মনস্তাপ নেই। সেই সঙ্গে আমাদেরও দেখতে হবে যে কর্ত্তৃপক্ষের ভুল নীতির অনুসরণের জন্য ভারতের এই আত্মত্যাগ যেন বিফলে না যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি যেন চূড়ান্ত ও অপ্রত্যবর্তনীয় হয় সে-বিষয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। এটা নাকি গণভোটের উপর নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আমাদের ওই প্রতিষ্ঠান থেকে কিছুই আর সুবিচার আশা করতে পারি না। জনগণের মনের ইচ্ছা জানার জন্য কোনও প্রশ্ন নেই। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরের বিধান সভা গঠিত হয়েছে। যদিও কতকগুলি আসনের নির্বাচনের বিশেষ করে জম্মুর কয়েকটি আসনের, বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। তাও এই মণ্ডলী হয়তো ভারত ভুক্তির সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে এবং তা জনমত গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে। এটা ওই রাজ্যের ভারতভুক্তির প্রশ্নে যাবতীয় অনিশ্চয়তা দূর করবে। শেখ আব্দুল্লা আমাকে বলেছিলেন তিনি তাহার সহকর্মীরা এই পদ্ধতি অনুমোদন করতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি এই পদ্ধতি অনুমোদন করতে প্রস্তুত নন।

সম্ভবতঃ ওই সময়ে আপনি নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান আশা করেছিলেন। এখন যেটা নিষ্ফল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আমাদের এখন যথাসম্ভব শীঘ্র পরবর্তী কার্যপ্রণালী ঘোষণা করা প্রয়োজন এবং এইভাবে ঘরে বাইরে জটিলতা পরিহার করা কর্তব্য।

প্রজাপরিষদ সঠিকভাবেই একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। যদি রাজ্যটির চূড়ান্ত ভারতভুক্তির প্রশ্নটি ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং সিদ্ধান্ত সাধারণ গণভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত করা স্থির হয় তাহলে জম্মুর ভাগ্যে কি হবে? যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে ভোট দেয়? এই প্রশ্ন আজগুবী বলে উড়িয়ে দেবেন না। আমরা ভারত বিভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভুলতে পারি না। খান আব্দুল গফুর খান ও তাহার সুযোগ্য ভ্রাতার দেশপ্রেমী ও প্রগতিশীল নেতৃত্ব সত্ত্বেও বিয়োগান্তিক পরিণতির কথা।

সাধারণ গণভোট একটি বিতর্কিত ব্যাপার যাহা সহজেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াতে পারে। বিশেষ করে পাকিস্তানি প্রচারের ফলে এবং এটা জনমত জানার সঠিক উপায় নয়। জম্মুর জনগণ স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বাস্তু হয়ে যাবার সম্ভাবনা পছন্দ করে না। গণভোট হোক বা না হোক, জম্মুর জনগণ কোনও পরিস্থিতিতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত নয়। এই জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে যত দেরী হবে, তত অধিক জটিলতা ও অশান্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে দুটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। একটি হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ যা পাকিস্তান অধিকার করে রয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করা। যদিও পাকিস্থান আক্রমণকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছে তবুও নিরাপত্তা পরিষদ আমাদের কোনও সাহায্য করবে না। পাকিস্তানও নিজে থেকে পরিত্যাগ করবে না এই এলাকায় তাদের নিয়ন্ত্রণ। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, আমরা কী করে ওই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে পারি। আপনি এ ব্যাপারে কী করতে চান তা আমাদের জানার সময় এসেছে। আমাদের দেশের এই অংশ যদি আমরা পুনরুদ্ধার না করতে পারি তা হলে তা জাতীয় অবমাননা ও কলঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

অন্য প্রশ্ন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তির গভীরতা প্রসঙ্গে। নিঃসন্দেহে ৩৭০ ধারায় লেখা হয়েছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের পূর্ব সম্পত্তি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কিন্তু আপনি স্মরণ করবেন সংবিধানের এই ধারাটি স্বল্পমেয়াদী এবং শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার যিনি এই ধারাটি গ্রহণের জন্য আবেদন করেছিলেন। তিনি স্পষ্টত এই কথা বলেছিলেন এটা সকলেরই আশা-আকাঙ্খা যে জম্মু ও কাশ্মীর শেষ পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের মতোই ভারতভুক্ত হয়ে যাবে, সুতরাং জম্মুর মানুষরা যদি দাবী করেন যে ওই রাজ্যের ভারতভুক্তি অন্যান্য রাজ্যের আদলেই হবে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই অসম্ভব ও অসঙ্গত হবে না। এটাই তাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা তারা দেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তারা এক অখণ্ড ও সংহত ভারত গঠনের উপর জোর দিচ্ছেন।

যে গণপরিষদ ভারতের সংবিধান রচনা করেছে শেখ আব্দুল্লা ও তার কয়েকজন সহকর্মী সেই পরিষদের সদস্য ছিলেন। সুতরাং যদি দাবী করেন যে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে ভারতভুক্তি শিথিল হলে দায়িত্বটা তাদের উপরই বর্তাচ্ছে। অন্য কারও উপর নয়। রাজ্যের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বা পৃথক নিশান রাখার ব্যাপারটা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। যারা আন্তরিক ভাবে মনে করেন ব্যাপারটা রাজনৈতিক, একতা বিপন্ন করতে পারে, যে একতা যেকোনও মূল্যে রক্ষা করা ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য ও নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। এই ধরনের দাবী যদি অন্যান্য রাজ্য করতো তাহলে সেটা বিপজ্জনক বিভেদপনার দিকে গতি সঞ্চার করতো। তাছাড়া গত জুলাইতে আপনার ঘোষিত কতকগুলি স্বীকৃত প্রস্তাব যথা নাগরিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাখা হয়েছিল। সেগুলির ব্যাপারে রূপদান করতে দেরী হওয়ায় মানুষের মনে নানা সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

জম্মুর মানুষরা যে মৌলিক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে বাকী সমস্ত ভারতে প্রযুক্ত সংবিধান দ্বারা শাসিত হওয়ার কী তাদের নেই? তার উত্তর দমনপীড়নের দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়।

কাশ্মীর উপত্যকায় মানুষরা যদি সম্পূর্ণভাবে ভারতভুক্ত না হতে চায় তার জন্য কি জম্মুবাসীরাও দুর্ভোগী হবে? এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান ধ্বনি যা আন্দোলনকারীরা তাদের সংগ্রামের মধ্যে উচ্চারণ করছেন, তা উচ্চ দেশপ্রেমী ও আবেগময় ধ্বনি, আপনি বা শেখ আব্দুল্লা বুলেট দিয়ে যা করছেন তাহা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। এটা কীভাবে সমাধান করতে হবে তা, বোঝাপড়া ও রাজনীতি কুশলতার ব্যাপার।

জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে আপনার থেকে ভালো কেউ জানে না। কাশ্মীর উপত্যকা, জম্মু ও লাডাখে ভিন্ন ধরনের মানুষ বাস করে। তাদের ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী, পরিবেশ, অভ্যাস, জীবনধারণ পদ্ধতি, পেশা ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতেই ভিন্ন। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে তারা একটি সমশ্বত্ব এককে পরিণত হয়েছে যা আমরা স্বাভাবিককভাবে পৃথক বা নষ্ট করতে চাই না। বল বা পীড়নের দ্বারা এই সমস্ত মানুষের মধ্যে একতা রক্ষা বা দৃঢ় করার কাজ করা যাবে না, বরং শুভেচ্ছা ও বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করেই তা সম্ভব। এটা একটা বিশাল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাও, যা সতর্ক ও নিপুণ হস্তক্ষেপ চায়। এই ব্যাপারে আপনি ও শেখ আব্দুলা অনেক কিছু করতে পারতেন এবং যাদের সঙ্গে রাজ্যটির ভবিষ্যৎ গঠন সম্পর্কিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মতভেদ আছে যদি তাদের প্রত্যেককে ভুল না বুঝতেন। আপনি জানেন রাজ্যের পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলে বাস করতেন এমন কয়েক হাজার মানুষ এখন ভারতে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করছে। তাদের বেশীরভাগই জম্মুর মানুষ। নানা অজুহাতে রাজ্যের মধ্যে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তারা দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। এমনকি পদ্ধতিগত কারণে শ্রীনগরের স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তারা জমা টাকাও তুলতে পারছে না। তাছাড়া চার হাজারেরও বেশী হিন্দু ও শিখ নারী এই অঞ্চল থেকে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে। একটি শ্রেণী হিসাবে শেখ আব্দুল্লা ও তার সহকর্মীরা ডোগরা জাতির প্রতি গালিগালাজ ও অনবরত আক্রমণ একটা তিক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। রাজ্যের জমিজমার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এই সব পরিবর্ত্তন অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব পরিবর্তন জম্মুর তুলনামূলকভাবে দরিদ্র মানুষের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা কেউ বিবেচনা করে দেখেনি। ফলে এই সব দরিদ্র মানুষের জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আমরা যদি সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান করতে চাই তাহলে এইসব ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয়াবলী মাথায় রাখা উচিৎ।

আমি এই চিঠিতে শেখ আব্দুল্লা সরকারের প্রশাসন ও বিভেদমূলক নীতি অনুসরণের বিরুদ্ধে গুরুত্ব ও অভিযোগগুলো উল্লেখ করছি না। এই সব ব্যাপারগুলো আপনার ও শেখ আব্দুল্লার কাছে প্রেরিত বক্তব্য পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা বিচার করা যেতে পারে।

যে সব মানুষেরা আনন্দের সঙ্গে আত্মত্যাগ ও দুর্দশা ভোগ করছে তারা ভারত বা জম্মু-কাশ্মীরের শত্রু নয় তাদের পাকিস্তানের বন্ধু বলে চিহ্নিত করা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পাকিস্তান

ভালোভাবেই জানে যদি এইসব মানুষের বক্তব্য গ্রহণ করা হয় তবে তাদের পক্ষে জম্মু ও কাশ্মীরকে কোনোদিনই পাকিস্তানভুক্ত করা সম্ভব হবে না। আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে আলোচনা করতে এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের সবাইকে মুক্ত করতে ও তাদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক শাস্তি ও আদেশাবলী প্রত্যাহার করতে। এরপরে একটা বৈঠক ডাকতে হবে, যাতে বিতর্কিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইবে এবং একটা সমাধানে পৌঁছোনো যাবে, যা সমগ্র ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক ও সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তদুপরি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের অধিকার ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি মিথ্যে অধিকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন না অথবা বৃটিশ প্রশাসনের পদ্ধতির অনুবর্তন করবেন না। যারা মনে করতো নিষ্ঠুর দমন-পীড়নের দ্বারা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার সমাধান করতে পারবে, সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি গাঁধীপন্থার প্রশংসা করেন। আপনার কাছে অনুরোধ, এই অচলাবস্থা অবসানের জন্য আপনি এই পন্থার প্রয়োগ করুন যা শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরেরই শান্তি বিপন্ন করছে না পরন্তু গোটা ভারতকে স্পর্শ করার মতো গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। আন্দোলনটি ছড়িয়ে পড়ছে এবং আরও পড়বে, এমনকি গোটা ভারতে প্রসারিত হবে, যদি কর্তৃপক্ষ দমনকেই একমাত্র প্রতিকার বলে জ্ঞান করে।

আমি জানি আপনি আমাদের গালিগালাজ করছেন, ব্যঙ্গ করেছেন এবং আমাদের সমালোচনার মধ্যে ভালো কিছুই দেখেননি। এই প্রসঙ্গে যদিও আপনার আশা-আকঙ্ক্ষা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এই চিঠি আপনাকে লিখতে বাধ্য হয়েছি। এবং অনুরোধ করেছি, আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের দৃষ্টিকোণ উপলব্ধি করতেও আপনি যে পথে চলেছেন তার থেকে ভিন্ন পথে চলতে। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে আমার আবেদন বৃথা যাবে না এবং জম্মুর গভীর অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন এবং তাদের মূল দাবীগুলি উপলব্ধি করে অগ্রসর হবেন। তাহলে একটা সম্মানজনক সমাধান হতে পারে এবং হবে।

আমি এই চিঠির কপি শেখ আব্দুল্লার কাছে পাঠাচ্ছি। আপনি যদি চান ব্যাপারটা নিয়ে আপনার ও শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে আলোচনা করি, তাহলে আমাকে জানাবেন এবং আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবো।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

পরের দিনই শ্যামাপ্রসাদের ৯ জানুয়ারি চিঠির উত্তর দিলেন জওহরলাল। তিনি লিখলেন, জম্মুর অবস্থা মোকাবিলা করার ব্যাপারে অহংবোধের প্রশ্নই নেই। কোনও পদক্ষেপ সঠিক হলে তা তিনি গ্রহণ করবেন। জম্মুর আন্দোলনে প্রজা পরিষদ হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। বহু

সরকারী কর্মচারী ও পুলিশ আহত হয়েছে, এবং ক্ষতি সাধন করা হয়েছে বহু সরকারী সম্পত্তির, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকারী কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি জানালেন, সরকার এই ধরনের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন হয় দমন করুক, না হয় পদত্যাগ করুক। কোনও মধ্যপন্থা হয় না, অর্থাৎ মিটমাট হয় না। আর প্রজাপরিষদের নেতারা সাক্ষাৎকার চেয়েছে এমন ঘটনা তিনি জানেন না। এতৎসত্ত্বেও তিনি খোলা মন রাখবেন এবং যেকোন ধরনের প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন জম্মুতে যা ঘটেছে তার জোরালো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে গোটা কাশ্মীর সমস্যার উপরে, জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যতের উপরে, পাকিস্তানের উপরে, ও জাতিসংঘের ও অন্যান্যদের উপর। সেজন্য সমস্যাটিকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা দরকার। জম্মুর আন্দোলন যদি সাফল্য লাভ করে তবে রাজ্যটির সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক বিনষ্ট করে দেবে।

দিল্লী চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি লিখলেন, আমরা এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি। জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে সমস্ত ভারতের ব্যাপার এক করে দেখলে চলবে না। এটা আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। বাস্তব পরিস্থিতি ও জাতির শক্তির সঙ্গে সমাকৃত করে রূপদান করতে হবে।

জওহরলাল স্বীকার করলেন শেখ আব্দুল্লাও তাঁর সহকর্মীরা জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদে একটি প্রস্তাব পাস করে রাজ্যটির ভারতভুক্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে, কীভাবে তাদের বিবেচনায় তা হতে দেয়নি।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত এবং জম্মু ও কাশ্মীর গণপরিষদের একটি সিদ্ধান্ত একে আরও বেশী চূড়ান্ত রূপ দিতে পারবে না। দিল্লী চুক্তি ভারতভুক্তির সমার্থক। তিনি আশ্বাস দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের যেকোনও ক্ষোভ বিবেচনা করার জন্য তিনি প্রস্তুত। প্রজাপরিষদের দাবী যেহেতু মূল সাংবিধানিক প্রসঙ্গে এবং এ বিষয়ে আর কিছু করা যাবে না। জম্মুর সমস্যা চিরতরে সমাধান করার জন্য কোনও যাদু নেই। নারী অপরহণ ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গে জানালেন, অপহৃতা নারীদের বহুজনকে উদ্ধার করা গেছে এবং ভারত থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে ওই রাজ্যে চিরতরে বাসের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পরিশেষে জানালেন জম্মুর সমস্যা সমাধান করার জন্য সঠিক পন্থা হচ্ছে আন্দোলন প্রত্যাহার করা এবং তার পরেও কোন ক্ষোভ থাকলে তার মোকাবিলা করা।

চিঠি (২)

১১ আশুতোষ মুখার্জী রোড
৩.২.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলাল জী

কিছুদিন হলো কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার লেখা চিঠির উত্তর আপনারে কাছ থেকে পেয়েছি। সেই থেকে আপনার ও শেখ আব্দুল্লার প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতা আমি পড়ছি। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে অবিরাম পত্রালাপ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি এমনই গভীর যে আপনার কাছে চিঠি লিখছি। দু'জনের বক্তৃতার মধ্যে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেটি হলো যাদের সঙ্গে আপনাদের মতপার্থক্য আছে, তাদের প্রতি অবিশ্রাম গালিগালাজ বর্ষণ। আপনি আমাদের প্রতি যাবতীয় অসৎ উদ্দেশ্য আহরণের অভিযোগ আরোপ করেছেন। এমনকি জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছেন। এই ব্যাপারে আপনাকে অনুকরণ করার ইচ্ছা আমার নেই। কোনও সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রোধ ও আবেগের বিস্ফোরণ কোনো কাজে আসবে না। এটা স্পষ্ট যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। তবুও আসুন আমরা নিজেদের বক্তব্যগুলি যুক্তির পথ ধরি এবং দেখি যদি কোনও সমাধানে পৌঁছোনো যায়। আমি আপনার উত্তর, আপনার ও শেখ আব্দুল্লার বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে পড়েছি।

দুঃখজনকভাবে সেগুলি কিন্তু মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে। প্রথমে আমাদের বিরুদ্ধে বারবার কৃত সাম্প্রদায়িকতা ও সঙ্কীর্ণতার কথায় আসা যাক। এটা অন্যায় অভিযোগ এবং অচেতনভাবে আপনি এই সব আক্রমণে মেতে উঠেছেন, শুধুমাত্র নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য, উচ্চতম জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের জীবনধারাতে আমরা সমস্যাটিকে দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমরা যে সমাধান চাইছি তা সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরবর্তী ও ভারতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে বা ভারতের সংহতি বিনষ্ট করতে চাইছি না। আমি আপনাকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে অনুরোধ করছি, যে, আপনার জীবনে আপনি কীভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কীভাবে তাহা শোচনীয় ফলদায়ক হয়েছে।

সম্ভবত সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি ও আপনার সহযোগীরা একটি তোষণ ও অনুগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে আপনাদের বারংবার উচ্চারিত ঘোষণার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দেশভাগ হয়েছে। একটা গুরুতর কারণ অবশ্যই ওই সময়ে বিদেশী শক্তির "বিভক্ত করো ও শাসন করো" তত্ত্ব আমাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। আজ আমরা সতর্ক হতে চাই এবং অতীতের শোচনীয় ভুল এড়াতে চাই। সেটা আমরা চাই দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থেই এবং কোনো সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য ও শ্রেণীগত স্বার্থের জন্য নয়।

কাশ্মীর সংক্রান্ত যেসব প্রশ্নগুলির সমাধান করতে হবে, সেগুলো হলো আমার মতে ঃ-

(১) প্রজাপরিষদের যথেষ্ট জনসমর্থন আছে। জনমানস সম্বন্ধে যেহেতু আপনার যথেষ্ট ধারণা আছে, সেহেতু জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের মতানুসারে আমরা কেন ওই সরকারকে সহমত হতে বলি না। শেখ আব্দুল্লা ও তাহার সহকর্মীরা যে ভারতের গণপরিষদের সদস্য ছিলেন সেই গণপরিষদ রচিত সংবিধান মেনে চলুন। যদি মনে হয় জম্মু ও কাশ্মীরের কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করা দরকার, তা হলেও আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো জানা দরকার। সেই মূল বিষয়াবলীর মধ্যে আছে মৌলিক অধিকার, নাগরিকত্বের অধিকার, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, জাতীয় পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সংহতি। এই বিষয়গুলির কয়েকটি সম্পর্কে ভারতীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য গত জুলাই মাসে ভারত সরকার ও শেখ আব্দুল্লা সরকারের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে। সংবিধানের এই বিচ্যুতিতে আমরা সন্তুষ্ট নই। তবুও সংবিধানের এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক টালবাহানা করা হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের মনে সৃষ্টি হচ্ছে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি। ভারতীয় সংবিধানের অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ হচ্ছে একই নিশান ও একই রাষ্ট্রপ্রধান।

শেখ আব্দুল্লা ও তার সহকর্মীদের অনুসৃত বিচ্ছন্নতাবাদ কীভাবে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমী বলে আপনার প্রশংসা পাচ্ছে সেটা বিস্ময়কর। অন্যদিকে প্রজা পরিষদের নির্ভেজাল ভারতের একতা সংহতির আকাঙ্ক্ষাকে এবং ভারতের অন্যান্য নাগরিকদের মতো একই ভাবে সমৃদ্ধি পাবার আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বাসঘাতকের কার্য বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

প্রজাপরিষদের উল্লিখিত মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার চিঠি ও বক্তৃতাতে কোনও উত্তর নেই। অর্থনৈতিক অগ্রগতি, চাকরি বাকরি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সীমান্ত জেলাগুলোকে পুনর্গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে জম্মুর মানুষদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। যেগুলি বিচারের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ কমিশন গঠনের। এই সমস্ত ব্যাপারে টালবাহানা আন্দোলনকে তীব্রতর করেছে।

এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে আমাদের এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে ভারতের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে, আমাদের শত্রুর হাত শক্ত করে। এই ব্যাপারটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অন্য সবার চেয়ে আপনার বেশী করে মনে রাখা দরকার। আপনার ভুল নীতি অনুসরণ ও বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিকোণ বোঝার অক্ষমতা থেকে, দেশ বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

জম্মু আন্দোলনের এখনও যাতে আবসান ঘটনানো যায় যেজন্য কিছু উপায় খোঁজার আকাঙ্ক্ষা থেকে আপনাকে চিঠি লিখছি। একমাত্র পথ হচ্ছে যাবতীয় বন্দীকে মুক্তি দিয়ে একটা বৈঠক আহ্বান করা, যাতে সর্ব-সম্মত সমাধানে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত সমস্যা নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডলে আলোচনা করা যাবে। জেলবন্দী, লাঠিচার্জ এবং বুলেটের সাহায্যে দমন, এই আন্দোলনকে বিনষ্ট করতে পারবে না। বস্তুতপক্ষে এ সবে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করবে, গভীর হবে এবং সারা ভারতে প্রভাব বিস্তার করবে।

সম্প্রতি কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ জম্মু পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল হতে চেয়েছিলেন। আপনি এবং আপনার সরকার তাদের এই পরিদর্শনে অনুমতি না দেওয়াটা সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে করেছে। এতৎসত্ত্বেও আপনি দাবী করেন জম্মু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত এবং শেখ আব্দুল্লা দাবী করেন তার লুকোবার কিছু নেই।

আপনি জানেন বলপ্রয়োগের দ্বারা জনপ্রিয় আন্দোলন দমন করা যায় না। প্রজাপরিষদের দাবী সম্বন্ধে আপনি একমত না হতে পারলেও, আপনি নিজেকে প্রজাপরিষদের আন্দোলনের পোষক ও সমর্থকদের অবস্থানে নিয়ে গিয়ে তাদের দৃষ্টিকোণ বিচার করার চেষ্টা করুন।

আপনি ও শেখ আব্দুল্লা প্রজাপরিষদ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। সেই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বিতর্ক করার ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু আপনারা যা যা বলেছেন তার অনেকটারই বাস্তব ভিত্তি নেই। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ এই পরিস্থিতিতে অপ্রাসঙ্গিক, প্রজাপরিষদের দাবীর গুণাগুণের ভিত্তিতে সমস্ত ব্যাপারটারই বিবেচনা করতে হবে।

(২) প্রথম প্রসঙ্গ যেটা উদ্ভূত হয়েছে তা হলো কবে এবং কীভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হবে। এটা যদি গণভোটের উপর নির্ভরশীল হয় তবে সেই গণভোটের চরিত্রই বা কী রকমের হবে? আমরা যে জাতিসংঘের কাছে গিয়েছি সেটা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি প্রসঙ্গে নয়। পরন্তু পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিপক্ষে নিরাপত্তার জন্য। জাতিসংঘের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশা নেই। নিঃসন্দেহে আপনি বারবার বলেছেন ভারতভূক্তি হবে জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী। আমাদের সরল দাবী হচ্ছে, ব্যাপারটার হেস্ত-নেস্ত এখনই হয়ে যাক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে কোনো লাভ নেই। আমার প্রস্তাব হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা, যা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, সেই সভা একটি প্রস্তাব পাশ করে ভারতভুক্তি চূড়ান্ত করুক এবং এই ভারতভুক্তি অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য বলেও বিবেচনা করা হউক। আপনার নিজস্ব ঘোষণা বা শেখ আব্দুল্লার বক্তৃতা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। ব্যাপারটি সমাধানে পৌঁছবার জন্য একটি সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। আপনি ও শেখ আব্দুল্লা কেন প্রস্তাবটি গ্রহণ করছেন না এবং প্রজাপরিষদের তোলা মূল সমস্যাটির সমাধান করছেন না কেন? এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে জানান, এবং এই প্রসঙ্গে প্রজাপরিষদের প্রস্তাব যদি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে ভারতভুক্তি করার জন্য অন্য কি প্রস্তাব আপনাদের আছে?

(৩) তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ ভূমি সম্পর্কে যা এখন পাকিস্তানের দখলে। যারা জম্মু ও কাশ্মীরকে বিভক্ত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আপনি জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। আমরা বিভাজন চাই না এবং আপনার অভিযোগ ও কাল্পনিক। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি ভুলে গেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরকে পাকিস্তান ইতিমধ্যে বিভাজন করে ফেলেছে এবং আসল প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি ও শেখ আব্দুল্লা এই বিভাজন নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন কিনা। আপনি এই প্রশ্নটিকে বরাবর এড়িয়ে গিয়েছেন। অনুগ্রহ করে প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

করবেন না এবং অনুগ্রহ করে জনগণকে জানান, কবে এবং কীভাবে, যদি আদৌ ঘটে, আমাদের প্রিয় ভূখণ্ডের এই অংশটিকে আমরা ফেরৎ পাবো?

(৪) চতুর্থ প্রশ্ন হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের কোণ কোণ বিষয়গুলির ভারতভুক্তি ঘটবে? প্রজাপরিষদ ও আমরা সর্বান্তকরণে মনে করি ভারতের বাকী অংশের উপর যে সংবিধান চালু আছে, সেই সংবিধানেই জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য শাসিত হোক। এই চাওয়ার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা, জাতীয়তাবিরোধিতা আছে। ভারতের সংবিধান যদি বাকী ভারতের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে তা জম্মু ও কাশ্মীরের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না কেন? সংবিধানের ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে একথা শেখ আব্দুল্লার উচ্চারণ করা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এই ধারার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা দুজনেই ওয়াকিবহাল। ধরে নিলাম প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যতিরেকে সব বিষয়ে ভারতভুক্তি হয়েছে। কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লীতে ৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জনসংঘের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন আছে। দেশের মানুষের একটি অংশ যাদের উদ্দেশ্য মহৎ, যথাযথ এবং মানুষের সুখ শান্তিকামী যেকোনও সরকার তাদের দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে, তাদের দুঃখ-কষ্ট আমরা অনন্তকাল ধরে নীরব থাকতে পারি না। আপনার ভীতি প্রদর্শন, গালাগালি, ও ধমকানি সত্ত্বেও আপনাকে আবার চিঠি লিখছি শুধু একটা প্রদর্শন করার জন্য যে আমার সঙ্কট সৃষ্টি করার কোন উদ্দেশ্য নয়। আমি এখনও আশা রাখি আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যাবতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। যে পথে আমরা দু'জনে একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারবো। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি আমি দিল্লী পৌঁছব, আপনি যদি মনে করেন সরাসরি আলোচনা করলে ভালো হবে তবে আগামী ৬ তারিখে সকালে আপনার কাছে যেতে পারি। আপনি অনুগ্রহ করে আমার ৩০ নং তুঘলক ক্রিসেন্টে, নয়াদিল্লী ঠিকানায় একটা বার্তা পাঠাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদের ৩ ফেব্রুয়ারির চিঠির উত্তর দুদিন পরেই দিলেন এবং জওহরলাল লিখলেন, আপনার চিঠিতে আমাকে ও আমার নীতিকে অভিযুক্ত করেছেন। ওই ব্যাপারে আমি কোনও বাক্যালাপ করতে চাই না।

আরও লিখলেন, আপনি যেমন বিশ্বাস করেন আমি কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভুল নীতি নিয়ে চলেছি, আমিও তেমনি বিশ্বাস করি কাশ্মীর প্রসঙ্গে ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে আপনি যে নীতি নিয়ে চলেছেন, তা ভারত ও আমরা যে নীতি নিয়ে চলি তার পক্ষে ক্ষতিকর. তাছাড়া যারা আমার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন এবং যাদের উদ্দেশ্য আমার উদ্দেশ্যের থেকে পৃথক, আমার পক্ষে তাদের বিচারধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব নয়।

জওহলালের ধারণা, প্রজাপরিষদের আন্দোলন শুধু সাম্প্রদায়িকই নয়, পরন্তু সাম্প্রদায়িক ও নীচুমনা ব্যক্তিদের দ্বারা সমর্থিত। ওই আন্দোলন শুধুমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বনাশই করবে না। সর্বনাশ করবে গোটা দেশের। সেজন্য ওই আন্দোলন প্রতিহত করার সবরকম চেষ্টা করা হবে। তিনি লিখলেন, জানি না আপনার পত্র আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করবে কিনা। তবে জম্মুর আন্দোলন ভারতের কাছে ভীতি প্রদর্শন, জম্মুর মানুষের মনে কিছু ক্ষোভ থাকতে পারে, যেগুলিতে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু আন্দোলনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই ক্ষোভের কোনও সম্পর্ক নেই। সম্প্রতি এই সমস্ত ক্ষোভের অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছেন। এতৎসত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আন্দোলনকারীরা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষোভের প্রশমন চান না। জম্মু ও কাশ্মীরের বিষয়াবলী বহুবার পার্লামেন্টে উঠেছে এবং এই ব্যাপারে যা যা করা হয়েছে, তা পার্লামেন্টের অনুমোদনেই করা হয়েছে। সুতরাং সাংবিধানিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। এই আন্দোলন সমস্ত জটিলতা সমেত আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গের বিরুদ্ধেও মত পোষণ করে এবং যাদের উদ্দেশ্য আমার উদ্দেশ্যের থেকে পৃথক। আমার পক্ষে তাদের বিচারধারা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব ও অধিকারের বিরুদ্ধে রণ-আহ্বান জানাচ্ছে এবং আপনি আমার কাছ থেকে যা আমার সরকারের কাছ থেকে এমনই সব উদ্যোগের প্রতি সমর্থন প্রত্যাশা করেন যা গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি ও গৃহীত নীতিসমূহকে আঘাত করে।

এরপরে তিনি লিখলেন, আপনি যে-সব প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর বহুবার পার্লামেন্টের দেওয়া হয়েছে। আমি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারি না। কারণ পার্লামেন্ট আমাকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক নীতির কথা বাদ দিলেও এই আন্দোলন দেশের শত্রুদের সাহায্য করবে।

এর পরে জওহরলাল এক মজার প্রশ্ন তুললেন। আপনি চাইছেন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দিয়ে সরকার তাদের সঙ্গেই আলোচনা করুক?

এটা কি করে হয়? তা হলে বিপন্ন হয়ে যায় সরকারের অস্তিত্বই। আন্দোলন চলতে থাকবে এবং সরকার তাদের সঙ্গে কথা বলবে। সেটা তো অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে জওহরলাল জানালেন দু'জনের সহমত হবার কোনই প্রসঙ্গই দেখতে পাচ্ছেন না।

তৃতীয় চিঠি

৩০, তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী
৭.২.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলালজী,

গতকাল সকালে আপনার ৫ ফেব্রুয়ারি চিঠি পেয়েছি। বিশ্বাস করুন আপনার সঙ্গে আমার অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী পত্রালাপ চালিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা ছিল না। দু'পক্ষে একে অপরের দৃষ্টিকোণ হৃদয়ঙ্গম করে এবং একটা সমাধান চুক্তিতে উপনীত হতে চেষ্টা করেছি। যাতে জম্মু ও কাশ্মীর সমেত গোটা দেশের মঙ্গল হয়, এমন কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা, সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। আপাতদৃষ্টিতে যারা আপনার সঙ্গে সহমত নয়, তাদের দৃষ্টিকোণ খোঁজার মানসিকতা আপনার নেই, কথা বলা তো দূরস্থান। আপনার চিঠিতে অনেক গালিগালাজে পূর্ণ করেছেন, আমি সেগুলির উত্তর দিচ্ছি না। আমি নিশ্চিত যে যুক্তি দিয়ে যুক্তিকে প্রতিহত কবতে পারেননি বলে এবং আপনার সঙ্গে যাদের সরকারী নীতির বিষয়ে মতপার্থক্য আছে, তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে কুশ্রী ইঙ্গিত করার জন্য আপনি পরে ঠাণ্ডা মাথায় অনুশোচনা করবেন। কাশ্মীর সরকারের গঠিত কমিশন কোনও আস্থা বা বিশ্বাস সঞ্চার করতে পারেনি। এর বিচার্য বিষয়সমূহ সঙ্কীর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ এর গঠনেও। অবিশ্বাস ও তিক্ততায় পরিপূর্ণ পরিমণ্ডলে একে কাজ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এই কমিশন মূলতঃ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে পারবে না।

আমি এবং আরও অনেকে একান্তভাবে অনুভব করি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আন্দোলনকারী আমাদের দেশের জনগণের এক অংশের, তাদের রাজ্যকে চূড়ান্তভাবে ভারতভুক্তি দেখার জন্য এবং ভারতের সংবিধান দ্বারা শাসিত হওয়ার দাবী বিচ্ছেদকামী, সাম্প্রদায়িক বা দেশপ্রেমহীন নয়। আপনি দমন ও বলপ্রয়োগের দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে হত্যা করতে পারবেন না। যদি আপনি ও শেখ আব্দুল্লার মত অনুযায়ী এই সব দাবীগুলিকে পূর্ণ করতে বাস্তব অসুবিধা থাকে, তাহলে ব্যাপারগুলো করার অন্য পদ্ধতি হচ্ছে, যাতে ভয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায়। জম্মু ও কাশ্মীরের সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি নিয়ে কদর্য্য কার্যক্রম করেছেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ভুল ও মনস্তাত্ত্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তারা।

বর্তমান আন্দোলন জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ তারা সাংবিধানিক উপায়ে কোনও প্রতিকার পাচ্ছিল না। এটা প্রবল স্থানীয় সমর্থন যুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। ওই রাজ্যের বাইরে থেকে আমরা কখনও এই আন্দোলনকে প্ররোচিত করিনি। পার্লামেন্টে আপনার এই অভিযোগ আমি অস্বীকার করেছি এবং এখনও করছি। নিঃসন্দেহ সত্যাগ্রহের পথ কোনও স্বাভাবিক পদ্ধতি নয় এবং পথটি হাল্কাভাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়। যদি প্রতিকারের

কোনও পথ তাদের কাছে খোলা থাকে, যখন তারা দেখে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের যাবতীয় প্রচেষ্টা, কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে তারা কোনো সাড়াই পাচ্ছে না।

এমনকি আজ যখন তারা তাদের জন্মগত অধিকার রক্ষার জন্য রক্ত ঝরাচ্ছে ও কষ্ট ভোগ করছে তখনও তারা আপনার সহানুভূতি ও করুণা উদ্রেক করতে পারছে না।

আপনার ও শেখ আব্দুল্লার কাছে তারা রাজনৈতিক অস্পৃশ্য। দুঃখজনক ঘটনাটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এই কারণে যে আন্দোলনকারীরা এমন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে যারা দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও সামরিক শক্তির জন্য বিখ্যাত।

আপনি যদি এই পথে সাফল্য লাভ করেন তবে তা আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাকে অধিকতর সম্মান ও শক্তি প্রদর্শন করবে। আপনার চিঠিতে একটা আপাত ভুল বুঝাবুঝির ব্যাপার আছে, যেটা আমি সংশোধন করাতে চাই। আপনি মনে করছেন জম্মুর আন্দোলন চলবে অথচ বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং জম্মুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করাও হবে। এটা ঠিক নয়। আপনি যদি প্রজাপরিষদের জন্য বৈঠকে বসতে রাজী হন তবে ওই সময় স্বাভাবিকভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকবে। এটা এই ধরনের যেকোনও ক্ষেত্রেই অতীতে করা হয়েছে। এটা আপনি আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই স্মরণ করতে পারবেন।

আমি গভীর ব্যথা নিয়ে এই চিঠি শেষ করছি, ভারতের বৃটিশ কর্তারা শক্তি ও সম্মানের গর্বভরে যেভাবে জনগণের ইচ্ছাকে পদদলিত করে চিঠি লিখতেন, আপনার চিঠির সঙ্গে সেই সব চিঠির বেদনাদায়ক সাদৃশ্য বর্তমান। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমাদের মতপার্থক্য থাকলেও আমরা একই মায়ের সন্তান এবং আমাদের দুপক্ষের সামান্য সদিচ্ছা ও সহনশীলতা থাকলে একটা গুরুতর বিভাজন এড়িয়ে যেতে পারব।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আপনি যদি মনে করেন সম্মানহানি ও অংশীদারিত্বের প্রশ্ন পাশে সরিয়ে রাখতে পারবেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমঝোতার সম্ভাবনা খুঁজে দেখবেন তাহলে আমাদের সর্বান্তকরণ সহযোগিতা আপনার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আমি এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এটা সম্ভব এবং একমাত্র আপনিই এই ব্যাপারেই উদ্যোগ নিতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত

শ্যামাপ্রসাদ

জওহরলালের উত্তর এলো

১০.২.১৯৫৩

জওহরলাল লিখলেন,

(১) একই শব্দ দু'জনের কাছে পৃথক অর্থ বহন করে। সেজন্য আমার কথা আপনার কাছে অপমানকর বোধ হচ্ছে। আপনার কথা আমার কাছেও একই বোধ নিয়ে আসছে।

(২) আমরা বা শেখ আব্দুল্লারা জম্মুর আন্দোলন দীর্ঘায়িত হোক, এটা চাই না। হতে পারে কাশ্মীর বা ভারত সরকারের অনুসৃত নীতি কিছু লোক পছন্দ করে না এবং আন্দোলনকারীদের অনশন ছাড়া অন্য পথও খোলা আছে।

(৩) এই আন্দোলনের ফলে এক হাজারেরও বেশী সরকারী কর্মী আহত হয়েছে এবং এটা কোনও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সাক্ষ্য নয়।

(৪) কমিশন সম্বন্ধে আপনার নানা আপত্তি আছে। কিন্তু কমিশনের কাজের জন্য হয় আন্দোলন বন্ধ করতে কিংবা ততো দিন কমিশনের ব্যাপারটা মুলতুবী রাখতে। দ্বিতীয় ব্যাপারটায় মানুষ আন্দোলনকারীদেরই দোষারোপ করবে।

(৫) জওহরলাল সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কমিশন গঠন ছাড়া অন্য কিছু হলে শ্যামাপ্রসাদ খুশী হতেন কিনা? তিনি সাফ বললেন কোনও কমিশন পার্লামেন্টের মাথায় বসে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী নিয়ে কাজ করতে পারে না।

(৬) শ্যামাপ্রসাদের অভিযোগের উত্তরে লিখলেন 'তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অতীতে কিছু ভুল করেছি কি না তা তাৎপর্যহীন। ব্যাপারগুলো যে অবস্থায় সেই মতো কাজ করতে হবে, তার সোজা প্রশ্ন 'নিখিল ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা জড়িত, এই সব বিষয়ে যদি তা সাংবিধানিক হয় তবে কী করে একটা আঞ্চলিক আন্দোলনের তা বিষয়বস্তু হতে পারে এবং তিনি তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন। তাঁর মতে জম্মুর একটা দল নিশ্চিত ভাবে দেশের চেয়ে বড় নয়। পার্লামেন্টে যখন দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছে তখন একটা স্থানীয় দল গোটা দেশকে স্পর্শ করে এমন একটা ব্যাপারে পার্লামেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না।

পার্লামেন্টের রূঢ় সংখ্যাধিক্যকে উচ্চ মূল্য দিতে চাইছেন তৎকালীন পঞ্চাশের দশকের প্রধানমন্ত্রী।

আপনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। গণতন্ত্র মানে কি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভার বলপূর্বক সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর চাপিয়ে দেওয়া? আমি স্বীকার করি সংখ্যালঘিষ্ঠরা সাধারণভাবে বাধা দেবে না বা অচল অবস্থা সৃষ্টি করবে না। এটা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই করা যাবে বা করতে হবে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা বিরোধীপক্ষের দৃষ্টিকোণ বুঝতে সমর্থ এবং উভয়পক্ষই সাধারণের মঙ্গলের জন্য যুক্তিসঙ্গত আপোষ মীমাংসা করতে প্রস্তুত। যখন একদলতান্ত্রিক মানসিকতার

জন্য এই মূল দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্হিত হয়, তখন বিপদগ্রস্ত হয় পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিক মূল ভিত্তি। পার্লামেন্ট দেশের চেয়ে বড় নয় এবং ভুল সরকারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের কাছে সময়োচিত সতর্কবাণী পৌঁছে দেওয়া বা জনগণের কাছে আবেদন রাখা কখনই পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ নয়।

আমি জানি না আপনি কীভাবে আমার চিঠিকে ভীতি প্রদর্শন বলে গণ্য করছেন। আমাদের ভীতি প্রদর্শনের কোনও ইচ্ছা নেই। সেরকম কিছু করার সামর্থ্য নেই। আমাদের সংগ্রাম যদি অপরিহার্যই হয় তবে তা হবে অহিংস চরিত্রের এবং তার উদ্দেশ্য হবে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ নথিবদ্ধ করার জন্য, যে সরকারী নীতি অন্যভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আমরা কেবল এইভাবেই জনমত জাগ্রত করতে পারি। কে জানে এই আন্দোলন আপনার ও শেখ আব্দুল্লার হৃদয়ে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে কি না?

ভীতিপ্রদর্শন ও বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ণশক্তি আপনার ও শেখ আব্দুল্লার হাতে। আপনার চিঠির সুর থেকে স্পষ্ট যে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আপনি তা ব্যবহার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আপনার ক্রোধ ও বিদ্বেষের সম্মুখীন হতে আমরা তৈরী বলে জানবেন। গতকাল পাঞ্জাবে আমাদের বেশ কিছু সদস্য ও কর্মীদের নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার, ভবিষ্যৎ ঘটনার সংকেত গ্রহণ করছে। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক অদ্ভুত ভাবে কাজ করছে, এই ঘটনায় তা প্রতিফলিত। শেখ আব্দুল্লা ও তার দলবল যারা বর্তমান কাশ্মীর নীতি সমর্থন করছে, তারা অপ্রতিহত সুযোগ পাচ্ছে, নিজেদের নিজেদের বক্তব্য প্রচার করবার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটিও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। এতৎসত্ত্বেও ভারতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি প্রায়ই গান্ধীবাদ, গাঁধীবাদী পদ্ধতি ও উপবাসকারী কর্মীদের কথা বলেন এবং দাবী করেন আপনার সরকার শক্তি ও বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী নয়। পরন্তু আলোচনা ও বোঝাপড়ার পথে যেতে সর্বদাই আগ্রহী। চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে গম্ভীর পরিণতিপ্রদ বিষয়াবলী সম্পর্কে আপনার ঘোষিত নীতির পথে চলতে বলার প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত সাড়া পায়নি আপনার কাছ থেকে।

জম্মুর আন্দোলনের ফলে আন্তর্জাতিক জটিলতা সম্বন্ধে আপনার বারবার উল্লেখ আমি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার ব্যবস্থাগ্রহণ আমাদের আন্তর্জাতিক সম্মান বৃদ্ধি করছে যা আন্তর্জাতিক সহানুভূতি ও সমর্থনযোগ্য হচ্ছে। এমনতর দাবী আজ কেউ করে না। বরং আমাদের অনুসৃত নীতি দেশে ও বিদেশে জটিলতার সৃষ্টি করছে। রাজনীতি কুশলতা দাবী করছে আপনি গোটা ব্যাপারটা নিস্পৃহ দৃষ্টিতে পুনঃ পর্যালোচনা করবেন, এবং মিথ্যা আন্তর্জাতিকতাবাদ দ্বারা তাড়িত হওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও স্বার্থের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার বাতাবরণ

সৃষ্টি করবেন। তিনি আবার সদর্পে ঘোষণা করলেন "পার্লামেন্ট যদি এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয় যা আমার মূল ধারণার বিপরীত তাহলে কর্তব্য হচ্ছে আমার পদত্যাগ করা।" আবারও বললেন যারা নিজেদের ইচ্ছাকে পার্লামেন্ট বা দেশের উপর চাপাতে চায় তাদের স্বৈরাচারী বলা হয়। (প্রকারান্তরে তিনি নিজেকে স্বৈরাচারী বললেন।)

জওহরলাল বললেন তিনি বাদানুবাদে যেতে চান না। তিনি পরিস্থিতির বিচার করেন ভারতের লক্ষ্য অনুযায়ী এবং ভারতের লক্ষ্য কী সে বিষয়ে তার ও শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যদিও তিনি সর্বান্তকরণে ভারতের শান্তি কামনা করেন। সেজন্য ভারতের পক্ষে ভুল ও অমঙ্গলনজক কাজ তিনি করতে পারেন না। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে পরোক্ষভাবে অনুরোধ করলেন তার প্রভাব ঘটিয়ে আন্দোলনের অবসান করার জন্য।

৪ চতুর্থ চিঠি

৩০ তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী
১২.২.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলালজী,

আপনার ১০ ফেব্রুয়ারি চিঠি দেবার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের বিভিন্ন মানসিক গোলকে বিচরণ করার যৌক্তিকতা বা সেই গোলকের ভালোমন্দ বিচার এই চিঠির উদ্দেশ্য সাধন করবে না। কিন্তু দেশের সত্যিকারের প্রয়োজনে দু'জনের মধ্যে কিছু মতৈক্য আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কতকগুলি ব্যাপারে মতপার্থক্য আমরা সততার সঙ্গে স্বীকার করতে পারি। বিভিন্ন গোলকে বিচরণ করেও আমরা কেন একে অপরের দৃষ্টিকোণ বুঝতে চাইব না। তার কোনও কারণ নেই।

আমি আপনার সঙ্গে সহমত পোষণ করি যে জম্মু বিতর্কে এই সমস্ত আলোচনা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর। আমাদের দুইজনের মতেই এই আন্দোলন যথাশীঘ্র সম্ভব শেষ হোক। প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও মূলনীতি বিসর্জন না করে কীভাবে তা সম্ভব।

আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক উপায়ে রাজ্যকে বাধ্য করে কারও দ্বারা কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই দুটি পক্ষের মধ্যে একত্র আলোচনার কোনও সাংবিধানিক উপায় না পাওয়ার ফলেই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। আপনি লিখেছেন আপনার কাছে ১০০ জন সরকারী কর্মচারীর তালিকা আছে যারা গত সপ্তাহে জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছে, তেমনি আমার কাছেও অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি ঘটনার একটি তালিকা আছে যা কর্তৃপক্ষের কোনও বাহাদুরী প্রতিপন্ন করে না। এছাড়া ৩০-৪০ জন লোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে অথচ সরকার পক্ষের একজন লোকও নিহত হয়নি।

এটা পরদর্শন করে জনতা যা করার করুক না কেন, আন্দোলনের উদ্যোক্তারা শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের নির্দেশ করেছেন। যা হউক এই সমস্ত ব্যাপারে আলোচনায় যাওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। আমি আপনার সঙ্গে সমভাবে উদ্বিগ্ন কী করে আন্দোলনটা শেষ করা যায়। আপনি আমার প্রভাব খাটিয়ে আন্দোলনটা শেষ করার কথা বলে ভালোই করেছেন। আমি তা করতে রাজী আছি, যদি আপনি ও শেখ আব্দুল্লা কাজটা বাস্তবায়িত করার জন্য উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেন।

এই কাজ করার একমাত্র উপায় হলো আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের উপলব্ধি করতে দেওয়া যে আপনি ও শেখ আব্দুল্লা দিল্লীতে কতিপয় নেতার সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হোন, যদি এই প্রস্তাব তাদের জানানো হয় আমি আশা করছি তারা আন্দোলন স্থগিত রাখবে।

আবার আপনি যদি মনে করেন মূল দাবী মেনে নেওয়ার সম্ভাব্যতাও আন্দোলন প্রত্যাহার প্রসঙ্গে আগে থাকতে কিছু বোঝাপড়া না থাকলে, এই পদ্ধতি জটিলতার সৃষ্টি করবে তাহলে যুক্তিতে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি।

স্বাভাবিকভাবে আমি প্রজাপরিষদকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাতে পারবো না। কিন্তু যেহেতু আমি তাদের মন কিছুটা জানি। আমি কিছু প্রস্তাব রাখছি আপনার বিবেচনার জন্য। যদি সাধারণ মতৈক্যে উপনীত হওয়া যায়, তবে আমি পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরাকে একটি চিঠি পাঠাতে পারি আমার উপদেশ সমেত।

বিবেচনার বিষয়বস্তু হলো ঃ-

(১) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের গণপরিষদের একটি প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা ভারতভুক্তি চূড়ান্ত হবে।

(২) মৌলিক অধিকার, নাগরিকত্ব, অর্থনৈতিক সমন্বয়, বহিঃশুল্ক প্রত্যাহার, সুপ্রীম কোর্ট, ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা এবং নির্বাচন পরিচালনা, রাজ্যের সংবিধানে ভারতের সংবিধানের এই বিষয়াবলী গ্রহণ করতে হবে। এই সব কার্যকর করতে হবে একটি সময়সীমার মধ্যে।

(৩) ভারতের সংবিধানের অন্য বিষয়াবলী সম্পর্কে শেখ আব্দুল্লা কি ধরনের পরিবর্তন চান তা তিনি জানাবেন এবং গুরুত্ব বুঝে তা বিবেচনা করতে হবে।

(৪) এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানকে ভারতের সংবিধানের অংশ করতে হবে।

(৫) সীমারেখার পরিবর্তন না করে জম্মু ও লাদাখকে স্বায়ত্ত শাসন দিতে হবে।

(৬) ভারতীয় পতাকার প্রাধান্য দিতে হবে।

(৭) পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের পুনর্দখল ও তার নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

(৮) ধর্মার্থ ট্রাস্ট, পুলিশিকৃত বাড়াবাড়ির জন্য ভুক্তভোগীদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, বিশেষ করে যারা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, এবং সমস্ত ক্ষোভের জন্য রাজ্য বহির্ভূত বিচারকদের নিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে।

(৯) যাদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে তাদের পেনশন ও সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করতে হবে।

যদি উভয়পক্ষই খোলা মন নিয়ে এগিয়ে আসে তবে উপরোক্ত বিষয়গুলির যুক্তিযুক্ত সমাধান একেবারে অসম্ভব নয়। আপনি যদি মনে করেন আমার পথ ঠিক তাহলে আমরা বিষদভাবে আলোচনা করতে পারি, তাহলে দেশ ও কাশ্মীর রাজ্যের স্বার্থে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। মিথ্যা অহমিকা ছেড়ে আপনি ও শেখ আব্দুল্লা যথা সময়ে যথা কর্তব্য পালন করেন এবং সৃষ্টি করতে পারেন এমন একটা পরিমণ্ডল যাতে অন্য সমস্ত বিভেদ ভুলে সবাই কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের জাতীয় দাবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আশা করি আমার এই চিঠি লেখার মানসিকতা উপলব্ধি করবেন এবং অচলাবস্থা অবসানের জন্য পদক্ষেপ নেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদের ১২ ফেব্রুয়ারি চিঠির উত্তর সেই দিনই দিলেন জওহর লাল।

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে যেকোনও বিষয় আলোচনা করতে প্রস্তুত বলেই তিনি জানালেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন সেগুলি বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা দূরঅস্ত কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষের আলোচনার বিষয় নয় বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন।

তিনি লিখলেন, জম্মু ও কাশ্মীর গণ পরিষদ দ্বারা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতভুক্তি সমর্থন করা যায় বটে, কিন্তু সেটা সেই অর্থে চূড়ান্ত ভারতভুক্তি হবে না। চূড়ান্ত ভারতভুক্তি অন্য অনেক কিছুর উপর জড়িত যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ দিল্লী চুক্তি সমর্থন করে ভারতভুক্তির চেয়ে বেশী কিছু করেছে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি জানালেন শ্যামাপ্রসাদের দাবীর অনেকগুলি বিষয়ই জম্মু কাশ্মীরের সংবিধানের মধ্যে থাকছে, যা কাশ্মীর গণপরিষদ তৈরী। জাতীয় পতাকা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন ভারতের জাতীয় পতাকাই চূড়ান্ত। কিন্তু ব্যাখ্যা করলেন না জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অন্য একটি রাজ্যের পতাকা কেন থাকবে। ২০১৬ সালে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের এক ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে শ্যামাপ্রসাদ এই ব্যাপারে অভ্রান্ত ছিলেন।

পাকিস্তান অধিকৃত এলাকা সম্বন্ধে বললেন, এই ব্যাপারে কোন পর্যালোচনা করা যাবে না এবং যোগ করলেন ব্যাপারটা বহুরকমের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

কোন্ সরকারিই এই বিষয়ে কিছুই করতে পারবে না।

আমরা গায়ের জোরে কোনও অঞ্চল ধরে রাখার চিন্তা করি না, বলেই তিনি জানালেন যদিও জানালেন না জম্মুবাসীদের কেন গায়ের জোরে কাশ্মীর উপত্যকা ভাগের সঙ্গে জড়িত রাখা হচ্ছে। তিনি লিখলেন, জম্মু কাশ্মীরের বাইরের অন্য প্রদেশেও আমরা প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে গররাজী।

জওহরলাল অভিমত প্রকাশ করলেন যে সঠিক পথ হচ্ছে ঃ

(১) আন্দোলন তুলে নেতারা এবং সমস্ত পক্ষ থেকে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। তিনি জানালেন বর্তমান মুহূর্তে Mr.G.S.Bajpai, পাকিস্তানী পক্ষ ও মিঃ গ্রাহামের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, সেই পরিস্থিতিতে জম্মুর আন্দোলন জেনেভার আলোচনার পক্ষে ক্ষতিকর। কথিত আছে G. S. Bajpai নেহেরুজীর জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাপার নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। পরে শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীকে তাহার নেহেরু বিরোধীতার মূল্য চুকাতে হয়েছিল।

পঞ্চম চিঠি

৩০, তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী
১৪.২.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলালজী

আপনার ১২ ফেব্রুয়ারীর পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আমার বিশ্বাস সমস্যাটা সমাধানের পথে অনেক পরিমাণে সরল হয়ে গেছে এবং আমরা যদি সত্যি সত্যিই ইচ্ছা করি তাহলে শীঘ্রই একটা সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছাতে পারি। যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলী আমি চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম সেগুলির উৎস ছিল জম্মুর জনগণের ভয় ও সন্দেহ।

আপনার ও শেখ আব্দুল্লার যা স্থির করা দরকার তা হলো, আপনারা তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক কি না এবং আমি আবার অনুনয় করবো আলোচনা করার জন্য এবং আপনি বলছেন সঠিক কাজ হচ্ছে আন্দোলন প্রত্যাহার করা।

একটা আন্দোলন যখন চলে এবং উদ্যোক্তারা বিশ্বাস করে তারা ন্যায্য কারণে লড়াই করছে এবং জীবন ত্যাগ করে কিংবা কষ্ট স্বীকার করে, তখন সমাধানের পথ নিশ্চয়ই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উদার বিবেচনার মধ্য দিয়ে যাবে। আমি প্রস্তাব করছি আপনি আর আব্দুল্লা সাহেব দু'জনে প্রজাপরিষদের নির্বাচিত কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলতে রাজী হোন এবং এর পরেই আন্দোলন আর হবে না। আমার বিশ্বাস এরপরেই শুরু হবে স্বাভাবিক অবস্থা ও শুভেচ্ছা ফিরিয়ে আনার পদ্ধতি। তাদের দৃষ্টিকোণ যদি সততা ও যথার্থতার ভিত্তিতে হয়েছে দেখা যায় তাহলে তারা আন্তরিকভাবে প্রতিদান দেবে না, একথা বিশ্বাস করার কোনও হেতু নেই।

আমি চিঠিতে কতগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলী উল্লেখ করেছিলাম যাতে আপনি বুঝতে পারেন কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনাকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রথম প্রশ্ন ঃ- ভারতভুক্তির ব্যাপারে চূড়ান্ততা নিয়ে এবং এই ব্যাপারে সারা ভারতের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আপনি ও শেখ আব্দুল্লা কাশ্মীর গণপরিষদে এই প্রস্তাব পাস হলে পাকিস্তান কিংবা রাষ্ট্রসংঘের কাজ থেকে আপত্তি উঠলেও এই ব্যাপারে আমাদের অবস্থান দুর্বল হবে না। বরং ভারত ও কাশ্মীরের সমস্ত দলের স্বেচ্ছা সমর্থিত জন সমর্থন আপনার উপর থাকবে।

আজ যদি জাতিসংঘ জানতে চায় জনগণের ইচ্ছা কিভাবে প্রতিফলিত হবে তখন আমরা বলতে পারবো জনমত প্রতিফলিত হয়েছে গণপরিষদের দ্বারা এবং ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে। পাকিস্তান ও জাতিসংঘের মধ্যে অচলাবস্থা চলতে থাকবে এবং পরে অন্য কোনও উপায় সমাধান করা যাবে।

আমি স্বীকার করছি যে জেনেভায় যখন কথা চলছে তখন এই ধরনের ঘোষণা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু জম্মুর অধিবাসীদের যদি এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া যায় আমি তাদের বলবো এতেই সন্তুষ্ট হতে এবং খোলাখুলি ঘোষণার জন্য চাপ না দিতে এবং জেনেভার বৈঠকের শেষে ব্যাপারগুলো স্বাভাবিকভাবে কার্যকর করা যাবে।

পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলের মুক্তি ও পুনরুদ্ধার বিষয়ে কোনও খোলাখুলি ঘোষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট লোকেদের সঙ্গে আলোচনার ফলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে অবহিত করা যেতে পারে। আপনি বলেছেন জাতীয় পতাকার ব্যাপারটা চূড়ান্ত এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে অতিরিক্ত হিসাবে রাজ্যের পতাকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

দিল্লি চুক্তির ব্যাপারে অনেকগুলি ধারা বিস্তারিত করতে হবে– যে স্বল্প সংখ্যক ধারা এখনই জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রযুক্ত হবে সে সম্পর্কে চুক্তিতে পৌঁছাতে কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্য সেই ধারাগুলি সম্বন্ধে রাজ্য সরকার কী প্রস্তাব আনেন সেগুলি না জানা পর্যন্ত আমরা সেগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারি।

ক্ষোভ প্রশমন ও অন্যান্য বিষয়ে শেখ আব্দুল্লা বারবার ঘোষণা করেছেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করেছেন এবং লিখেছেন তিনি একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন করতে চান যার কাজ হচ্ছে বিচার্য বিষয় ঠিক করা এবং একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা, যা সকলের বিশ্বাস অর্জন করবে।

আমার বিশ্বাস নতুনভাবে বিশ্বাসের পরিমণ্ডলের মধ্যে আমরা এগোতে পারছি। আমি মনে করি এই আন্দোলন চলতে থাকলে এবং তা ভারতের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে তার প্রতিক্রিয়া গভীর হতে পারে। এটা কীভাবে এড়াতে পারা যাবে সে ব্যাপারে আমি সত্যই উৎকণ্ঠিত। আপনার শেষ চিঠি আমাকে আশ্বাস দিয়েছে এবং ব্যাপারটা সম্ভাবনার বাইরে

নয়। আপনার ও শেখ আব্দুল্লার হাতে সরকারী ক্ষমতা আছে এবং সেজন্য স্বাভাবিকভাবে আপনারা বেশী শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। নীতি বিসর্জন না দিয়েই আপনারা আগ্রসর হতে পারেন এবং আমাদের সকলের জন্য একটা পরিমণ্ডল তৈরী করতে পারেন। যাতে অন্য বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কাশ্মীর প্রশ্নে আমরা যুক্ত ফ্রন্ট তৈরী করতে পারি।

কাল খুব সকালে কলকাতা চলে যাচ্ছি আমি, ফিরে আসবো সোমবার বিকেলে, ব্যক্তিগত আলোচনা যদি এই সময় বোধ করেন তবে আজ যেকোনও সময়ে আমি দেখা করতে পারি। আপনার মত শেখ আব্দুল্লাকে জানাতে হবে এবং শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে আপনার মত চূড়ান্ত করার আগে। তার শেষ চিঠির উত্তরে আমি কাল তাকে একটা চিঠি লিখেছি এবং আপনার সঙ্গে পত্রালাপের কপিও তাকে দিয়েছি, অবশ্য আপনার ১২ ফেব্রুয়ারির চিঠির কপি তাকে দিতে পারিনি যেহেতু সেই চিঠি তখনও আমার কাছে পৌঁছায়। আজ আপনার পছন্দের মতো যেকোনও সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি, অবশ্য সন্ধ্যা ৬-৭টার সময় বাদ দিয়ে।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্যামাপ্রসাদ

পরের দিনই শ্যামপ্রসাদের ১৪ ফেব্রুয়ারির চিঠির উত্তর দিলেন জওহরলাল। ওই চিঠিতে তিনি একগাদা জল ঢেলে দিলেন প্রজাপরিষদের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাবের উপর। তিনি জানালেন আন্দোলকারীদের বিনা শর্তেই আন্দোলন তুলে নিতে হবে। আন্দোলন তুলে নেওয়ার কোনও শর্তে কোনও বৈঠক হবে না, কারণ আন্দোলনকারীদের বিনা শর্তেই আন্দোলন তুলতে হবে কারণ তাঁদের অতীত চরিত্র স্বচ্ছ নয়, তারা অতীতে সাম্প্রদায়িক কার্যে লিপ্ত ছিল।

তিনি অবশ্য লিখলেন এই বিপজ্জনক আন্দোলন ও দ্বন্দ্ব সমাপন করে জম্মুতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে আমরা যে উৎকণ্ঠিত এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ যে সব প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন সেসব বিষয়ে কেবলমাত্র দুটো সরকারের মধ্যেই আলোচনা হতে পারে। অন্য কারও সঙ্গে নয়।

ঐ চিঠিতে সমস্যা সমাধানের দায় এড়িয়ে গিয়ে তিনি জানালেন, এসব সমস্যা রাজ্য সরকারের অধীন এবং কেন্দ্রীয় সরকার শুধু রাজ্যগুলির উপদেশই দিতে পারে। তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি শুধু মাত্র কাশ্মীরের গণপরিষদের হাতে আছে বলে তিনি জানালেন, লিখলেন কাশ্মীর সরকার এইসব পদ্ধতিকে কাটিয়ে যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন না।

তবে তিনি মনে করেন না এইভাবে ব্যাপারটা জাতিসংঘে উত্থাপনের অবসান ঘটাবে। তিনি লিখলেন, জাতিসংঘে আমরা যা আশ্বাস দিয়েছি তা আমাদের দায়িত্বে এবং সেই অনুযায়ীই ব্যাপারটা বিচার করতে হবে।

প্রজাপরিষদের সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতায় আসতে না পারার কারণ সম্পর্কে তিনি জানালেন, "গোটা ব্যাপারটায় যে পটভূমি তাতে এই পথে নিয়ে যায় এক উগ্র সাম্প্রদায়িকতাতে।" কারণ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বহু লোকই অতীতে এমন একটি পথ নিয়েছিলেন যা আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িক এবং দেশের স্বার্থবিরোধী। আমি নিশ্চিত যে শেখ আব্দুল্লাও তাঁর সরকার একই মত পোষণ করবেন।

৬নং চিঠি

৩০ তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী
১৫.২.১৯৫৩

প্রিয় জওহরলালজী

আপনার ১৫ ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ যা কলিকাতা থেকে ফিরে পেয়েছি। আমার আগের চিঠিগুলিতে আপনার বিবেচনার জন্য যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম সেগুলিকে পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছা আমার নেই।

আপনি আবার আপনার প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এনেছেন। আমি ইতিমধ্যে এটা অস্বীকার করেছি এবং যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে এমন কয়েকটি মূল বিষয়ে আমাদের মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছি। সম্পর্কহীন ব্যাপারে আমরা যখন আলোচনা করতে শুরু করি, তখন আলোচনা জটিল হয়ে দাঁড়ায়, আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ হানি।

আমাদের এই সমস্ত বিষয়ে পরস্পর অবিশ্বাসের বাতাবরণ সরিয়ে রেখে এবং এই অবিশ্বাসের জন্য জম্মুর আন্দোলন দ্রুত অবসানের পথ খুঁজে পাবে না।

দিল্লীতে নির্বাচনী সমাবেশের বক্তৃতার প্রতিবেদনের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন। আমি নিজে তিন তিনটি সমাবেশে যোগ দিয়েছি। সেক্ষেত্রে বক্তৃতায় বিশদ প্রতিবেদন সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। বোধহয় কতকগুলো বক্তৃতা নিঃসন্দেহে উগ্র এবং বক্তার দৃষ্টিপথ সম্বন্ধে সৎ মতপার্থক্য থাকতে পারে। তবে গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেশিত সংবাদের উপর বিশ্বাস করা নির্ভরযোগ্য নয়। কংগ্রেসী মঞ্চ থেকে দেওয়া বক্তৃতার কিছু প্রতিবেদন আমি পেয়েছি। সেগুলি শুধু খারাপ রুচি বহন করে না, পরন্তু মিথ্যা ও বিকৃত। আমি নিজে কংগ্রেসী শোভাযাত্রীদের উচ্চারিত ধ্বনি শুনেছি। যখন আমার গাড়ী ওই ধরনের শোভাযাত্রার শেষ দিকে চলছিল, আমি সেগুলি ধরিনি, কারণ আমি জানি দলীয় উন্মাদনা অনেক সময় সমর্থকদের মাথা ঘুরিয়ে দেয় এবং সেসব সমর্থকদের হাল্কাভাবেই নিতে হয়। এ সমস্ত ব্যাপার অনেক সময় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের প্রশ্নের

মুখে ফেলে দেয়। এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের এখনকার কাজে জম্মুর আন্দোলন সমাপন করার ব্যাপারে কোনও প্রভাব সৃষ্টি করবে না এবং করা উচিৎ নয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে দু'পক্ষেই এ ব্যাপারে খোলা মন নিয়ে আলোচনা না হওয়ার কোনও কারণ নেই। তেমনি যদি দেখা যায় জাতীয় স্বার্থে নীতির পরিবর্তন দরকার তাহলে সরকারের নীতি পরিবর্তনে রাজী না হওয়ারও কোনও কারণ নেই। সাংবিধানিক পদ্ধতির জটিলতার কথা এখানে অবান্তর।

আসল কথা হচ্ছে আন্দোলন কীভাবে শেষ করা যায়। আমি যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছি সেটা আপনার মনঃপূত নয় বলে মনে হচ্ছে। দুঃখের বিষয় আন্দোলন বিনা শর্তে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই বক্তব্য পনুর্বার রাখা ছাড়া আপনি কোনও বিকল্প পদ্ধতি প্রস্তাব করেননি।

সঙ্গে সঙ্গে আপনি যোগ করেছেন যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করবেন। কিন্তু সেটা যে সমস্যা সমাধানের কোনও বাতাবরণ সৃষ্টি করবে না এটা আপনি স্বীকার করবেন।

যখন একটা আন্দোলন কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে তাতে বিভিন্ন ধরনের জুলুম ও বাড়াবাড়ি চলে এবং লক্ষ্যগুলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিবেচিত হবে কর্তৃপক্ষের এইরূপ আশ্বাস না পাওয়ায় ততক্ষণ আন্দোলন প্রত্যাহার করা যায় না। আপনি এখানে উপলব্ধি করবেন। আমার জন্য বা ভারতের অন্য কারও জন্য এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা যায় না। বলা বাহুল্য নেতারা অনেকেই কারাগারের অন্তরালে এবং এ বিষয়ে কী হবে এ সম্পর্কে সামান্য ধারণা তাদের কাছে পৌঁছনো দরকার।

আন্দোলন আগে প্রত্যাহার করতে হবে আপনার ওই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য ব্যাপারগুলি বিবেচনা করে আমি লিখিত পদ্ধতিগুলি আপনার বিবেচনার জন্য পাঠাচ্ছি।

(১) আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবে।

(২) বন্দিমুক্তির নির্দেশ দেওয়া হবে এবং কাউকে বলি করা হবে না।

(৩) আশা করি দিন পনেরোর মধ্যে আপনি ও শেখ আব্দুল্লা একটা বৈঠক ডাকবেন সেখানে আপনি ও শেখ আব্দুল্লার উপস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো খোলা মনে আলোচিত হইবে।

(৪) উভয়পক্ষকে পুনর্বার বলতে হবে যে জম্মুও কাশ্মীরের একতা বজায় রাখা হবে এবং স্বশাসন নীতি সমগ্র জম্মু, কাশ্মীর এবং লাডাখে প্রযুক্ত হবে।

(৫) নতুন সংবিধান যথাশীঘ্র বলবৎ হবে এবং অন্ততঃ ছয় মাসের মধ্যে সেখানে নির্বাচন করতে হবে।

(৬) জাতীয় পতাকা সেখানে ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো ব্যবহৃত হবে।

(৭) অস্পষ্ট ব্যাপার স্পষ্ট করে জুলাই চুক্তির বিষয়গুলি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদের আগামী অধিবেশনেই কার্যকরী করতে হবে। মৌলিক অধিকার, নাগরিকত্ব, সুপ্রীমকোর্ট, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, অর্থনৈতিক সংহতি, নির্বাচন পরিচালনা এই সমস্ত ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থাগুলি প্রযুক্ত হবে। জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে শর্তাবলী সম্পর্কে পৃথক ব্যবস্থা থাকতে পারে।

(৮) তদন্ত কমিশনে এখন চারজন সদস্য আছে তার মধ্যে একজন প্রধান বিচারক বাদে বাকী ৩ জন সরকারী প্রশাসক, যথা—অ্যাকাউন্টটেন্ট জেনারেল, চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্টস্ এবং রাজস্ব সচিব। অতএব বিশ্বাস অর্জন করার জন্য যদি কোন সাধারণ চুক্তি হয় তবে শ্রী প্রেমনাথ ডোগরার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। শান্তিপূর্ণ এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের উপদেশ তাঁর জন্য থাকবে। আমি নিশ্চিত যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা চুক্তি প্রতিহত করার মানসিকতা গ্রহণ করবেন না।

দমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি ভীতিপ্রদ সংবাদ পাচ্ছি। এর মধ্যে স্ত্রীলোকের শ্লীলতা হানির সংবাদও আছে। আন্দোলন দমানোর জন্য সেনাবাহিনীকেও কাজে লাগানো হয়েছে। অবশ্য সেনাদলের বেশীরভাগ লোকই শেখ আব্দুল্লা দলের। সেখানে সংখ্যাগুরু যেহেতু মুসলমান উপদ্রুত অঞ্চলে তাদের গোলমালে কাজকর্মের খবর ইতিমধ্যে পৌঁছাবে। এবং এখন যদি সরকারীভাবে ব্যবহার করা হয় তবে ব্যাপারটা এক ভয়ঙ্কর মোড় নেবে। এখনও পর্যন্ত কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেনি এবং সরকার পক্ষের কোনও প্রাণ হানি হয়নি। এখন যদি সরকার আন্দোলন দমনের নাম করে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর উপর নির্ভর করতে চায় তাহলে ব্যাপারটা এক ভয়ানক পরিণতির দিকে এগোতে পারে।

একটা সমাধানে পৌছানোর জন্য আমি চেষ্টা করছি। প্রজাপরিষদের জন্য আমি কারও কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারি না। এবং যা বলেছি নিজ দায়িত্বে। কিন্তু আমি একটা সাধারণ পথ দেখিয়েছি এবং আশা করি এটা এই দুর্ভাগ্য পরিস্থিতিটা সমাপ্ত করেত পারবে।

আপনি যদি মনে করেন উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গুরুত্ব সহকরে বিবেচনা করার যোগ্য এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, তবে আপনার সুবিধামতো আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি। আপনি যদি ঠিক করেন যে আন্দোলন বিনা শর্তেই প্রত্যাহার করতে হবে এবং বোঝাপড়ার কোনও দরকার নেই তাহলে আমি বুঝবো আমার এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এটা আমি খুব দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

আপনার বিশ্বস্ত

শ্যামাপ্রসাদ

শেখ আব্দুল্লাকে লেখা চিঠি

১নং চিঠি

৩০ তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী
৯.১.১৯৫৩

প্রিয় শেখ সাহেব

আজ আমার জওহরলাল নেহেরুকে লেখা চিঠির প্রতিলিপিও এই সঙ্গে পাঠালুম।

চিঠিতে যে লিখেছি তা আপনার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি, যে আপনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে জম্মুর আন্দোলনের অবসান ঘটানো। আপনি নিজের জীবনের ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে কোন জনপ্রিয় আন্দোলন বলপ্রয়োগ করে দমন করা যায় না। আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য আপনাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিপক্ষের যুক্তিসম্মত দাবীগুলিকে, আপনাকে মেনে নিতে হবে একজন গণতান্ত্রিক নেতা হিসাবে।

বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যা যে আপনার রাজ্যকে প্রভাবিত করছে তা নয়, এটা কিন্তু গোটা ভারতকেই প্রভাবিত করছে এবং আমি আশা করছি যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই আপনি ব্যবস্থা নেবেন। এই মানসিকতা নিয়ে আমি নেহেরুকে এবং আপনাকে চিঠি লিখছি এবং আপনি তা উপলব্ধি করবেন। গালাগাল ও পাল্টা গালাগাল কোনও কাজে আসবে না। এই সমস্যা বোঝাপড়া ও শুভ বিশ্বাসের মানসিকতায় আলোচনার যোগ্য এবং সকলের পক্ষে মঙ্গলকর ও ন্যায্য সমাধানে পৌঁছুতে সমর্থ হবো।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্যামাপ্রসাদ

শেখ আব্দুল্লা শ্যামাপ্রসাদকে তার ৯.১.৫৩ চিঠির উত্তর দিলেন ৪.২.৫৩ জম্মু তাওয়াই থেকে, যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদে ছিলেন। শেখ আব্দুল্লা উত্তরে লিখলেন যে প্রায় পাঁচ মাস আগে যখন তাদের শ্রীনগরে দেখা হয়েছিলো তখন তিনি শ্যামাপ্রসাদকে জম্মু ও কাশ্মীরের দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন এবং শ্যামাপ্রসাদ তাদের অবস্থান কিছুটা উপলব্ধিও করতে পেরেছিলেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরপরেও তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সে সম্পর্কে অনেকটা সহানুভূতির কথা বলেন শ্যামাপ্রসাদ। এখন অবশ্য শেখ আব্দুল্লার জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের নিস্পৃহ দৃষ্টিতে না দেখানোয় তাঁকে ব্যথিত করেছে।

শেখ আব্দুল্লা প্রজাপরিষদের দাবী সম্পর্কে বললেন যে প্রজাপরিষদ পুরোপুরি

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে তাদের দাবী আদায় করতে চায় এবং এই ব্যাপারে তার হাতে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে। প্রমাণ স্বরূপ তিনি প্রজাপরিষদের কিছু নেতার বক্তব্য পেশ করলেন।

প্রথম বক্তব্যের অংশ– আমাদের পথ কাশ্মীরের সঙ্গে নেই। শেখ আব্দুল্লা আমাদের গ্রহণযোগ্য নয়। জম্মু ও লাদাখকে আমরা ভেসে যেতে দিতে পারি না। আমরা চাই প্রজা পরিষদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকুক জনগণের এবং "লোটা কম্বল" পরে তারা অধিকার অর্জনের জন্য তৈরী থাকুন।

মদনলাল–শহর প্রজাপরিষদের সেক্রেটারি
সম্বাতে বক্তৃতা, তাং, ২০.১০.৫২

দ্বিতীয় বক্তৃতার অংশ– আমরা শেখ আব্দুল্লা ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের অন্যান্য নেতাদের শেষ করবো। আমরা তাদের রক্ত চুষবো এবং এই সরকারকে উৎখাত করবো এবং তাদের কাশ্মীরে পাঠাবো আমরা এই রাজ চাই না।

শ্রীঋষি কুমার কৌশল
রিয়াসী ২৩/১১/৫২

শেখ আব্দুল্লা প্রজা পরিষদের সাম্প্রতিক এক প্রকাশনা থেকে উদ্ধৃতি দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের ৭৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত গণপরিষদের সদস্যের বিস্তারিত বিবরণ।

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	বৌদ্ধ	মোট
কাশ্মীর	৩	৪১	-	৪৪
জম্মু	২১	৮	-	২৯
লাদাখ	-	১	১	২
মোট	২৪	৫০	১	৭৫

শেখ আব্দুল্লা প্রমাণ করতে চাইলেন যে তার মুসলিম আধিপত্য জম্মু ও লাদাখের হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

শ্যামাপ্রসাদ উল্লিখিত প্রজাপরিষদের আন্দোলনে মুসলিমদের যোগদান প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল্লা জানালেন সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন না, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। তাহার কারণ প্রজাপরিষদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও তার অতীত ইতিহাস। উল্টে উপদ্রুত এলাকা থেকে মুসলমানরা নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। শুধু জম্মু নয় কাশ্মীর ও লাদাখের সেই একই অবস্থা। তিনি সমস্যার মূলে জাতিসংঘকে দায়ী করেছেন। তিনি সমস্ত সমস্যার জন্য প্রজাপরিষদকে দায়ী করলেন। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরকে জাতীয় সমস্যা বলতে নারাজ। কারণ কাশ্মীরের সমস্যা সম্বন্ধে সমস্ত জাতীয় দলের ভিন্ন ভিন্ন মত। তার ধারণা জাতীয় দলগুলোর বিশেষ অজ্ঞতা ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য।

এই অনৈক্য শুধু লক্ষ্য সম্পর্কেই নয় কিন্তু লক্ষ্যপূরনের পন্থা সম্পর্কেও। তিনি মনে করেন এই অনৈক্যই জিনিসটাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তিনি লিখলেন যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরই জানবার আইনগত অধিকার আছে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে অজ্ঞতা এবং সমস্যার জন্য বিচারধারাকে বিপথগামী করেছে। তিনি অবগত আছেন যে অকালী নেতা মাস্টার তারা সিং এর সমর্থন জনসংঘের পেছনে আছে এবং মাস্টার তারা সিং এই ব্যাপারে কি মত পোষণ করেন সেটা জানা দরকার, তিনি আরও দাবী করেন সে লক্ষ্ণৌতে তারা সিং বলেছেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানের এবং এটা একটা মুসলিম রাষ্ট্র। তারা সিং আরও দাবী করেন যে উদ্বাস্তুরা অনেক সম্পদ পাকিস্তানে ফেলে এসেছে তাই তার বদলে কাশ্মীর দাবী করছেন। তিনি আরও দাবী করেছেন যে কাশ্মীর থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিতে হবে পাকিস্তানে, কারণ তারা সেই দেশের লোক।

শেখ আবদুল্লা আরও জানালেন যে হিন্দু মহাসভার ভোপাল অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সভাপতি নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে (১) জাতিসংঘ থেকে কাশ্মীর সমস্যাকে বের করে আনার জন্য হিন্দু মহাসভা লড়াই করবে। (২) জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি জন্য এবং (৩) ভারতীয় সংবিধান কাশ্মীরের গ্রহণ করার জন্য। শেখ আবদুল্লা আরও জানালেন যে জনসংঘের কাশ্মীর সম্বন্ধে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং শ্যামাপ্রসাদ সেগুলি মাঝে মাঝে প্রকাশ করছেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে শ্যামাপ্রসাদের চিঠির প্রতিলিপিও সাংবাদিকদের কাছে বিতরণ করলেন। শেখ আবদুল্লা আরও দাবী করলেন যে তিনি গণপরিষদের অধিবেশন ডেকে ভারতভুক্তিতে সম্মত আছেন, কিন্তু এই বিষয়ে জাতিসংঘের কাছে কাশ্মীর সমস্যা জিইয়ে রাখা হয়েছে এবং জাতিসংঘ অনুকূল অবস্থায় গণভোট করতে চায়। তিনি আরও আশা প্রকাশ করলেন যে শীঘ্রই গণভোট করার মতো অবস্থা তৈরী হবে এবং অবস্থা তাহাদের (শেখ আবদুল্লার) অনুকূলে যাবে।

তিনি আরও জানালেন যে তিনি সব অংশের মধ্যে ঐক্য রাখার চেষ্টা করছেন এবং অনৈক্যের মধ্যে পাকিস্তান পুরোপুরি তার সুযোগ নেবে।

শেখ আবদুল্লা সাংবিধানিক ব্যবস্থাই ভারতভুক্তির ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করছে কারণ সংবিধানের ৩৭০ ধারাই এই সম্পর্কের জন্য দায়ী।

২য় চিঠি

আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা -২৫
৩.২.১৯৫৩

প্রিয় শেখ সাহেব

আমি জওহরলাল নেহেরুকে লেখা চিঠির উত্তর পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে লেখা চিঠির প্রতিলিপি আপনার কাছেও পাঠিয়ে ছিলাম, কিন্তু আপনার কাছ থেকে তার প্রাপ্তি স্বীকার

পত্রও পাইনি, এতৎসত্ত্বেও নেহেরুর চিঠির জবাবের একটি কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমি ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লী পৌছবো। এটা দুঃখের ব্যাপার যে আপনার সঙ্গে যাদের মতপার্থক্য আছে তাদের আপনি ভুল বুঝছেন এবং এমনভাবে চলছেন যাতে ভারত এবং জম্মু ও কাশ্মীর উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমি এখনও আশা করি আপনি সময়োচিত হয়ে উঠবেন এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের একটা পথ খুঁজে বের করবেন

আপনার বিশ্বস্ত

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদের এই চিঠির উত্তর ৫ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও তাওয়াই থেকে শেখ আবদুল্লা লিখছেন, আপনি জম্মুর লোকেদের ক্ষোভের কথা বলতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে জেলা ভাগের প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এ ব্যাপারে তাহার তথ্যদপ্তর প্রকাশিত একটি হ্যান্ডবিল পাঠিয়েছিলেন এবং আশা করেছেন যে শ্যামাপ্রসাদ ওটা পড়ে দেখবেন এবং ওই পুনর্বিন্যাসের মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িকতা নেই।

৩য় চিঠি

৩৩ তুঘলক ক্রিসেন্ট নয়াদিল্লী

১৩.২.১৯৫৩

প্রিয় শেখ সাহেব

কয়েকদিন আগে আপনার ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি দুটি চিঠিই পেয়েছি। ইতিমধ্যে নেহেরুর সঙ্গে আমার আরও পত্রালাপ হয়েছে। তার কপিগুলো আমি এই সঙ্গে পাঠালুম। খোলাখুলি ও বিস্তারিতভাবে আপনার মনোভাব জানানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেসব পুস্তিকা পাঠিয়েছেন সেগুলি আমি চোখ বুলিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছি। কয়েক মাস আগে শ্রীনগরে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কতকগুলি মূল সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে গভীর ফারাক তৈরী হয়েছে এবং এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টিকোণ ও আপনার পথের অসুবিধার কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি। যদি আমাদের মধ্যে গালিগালাজ ও পরস্পর দোষারোপের পর্যায়ে চলে যায় তাহলে আমরা কোনও সমাধান প্রত্যাশা করতে পারি না।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য যাতে আপনি আপনার সমালোচকদের বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু বলে অভিহিত করেছেন। সেগুলি আমি বুঝতে অপারগ, একটি মূল বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত। সেটি হলো আপনার প্রজাপরিষদ সম্বন্ধে আপনার মনোভাব। আপনি স্মরণ রাখবেন শ্রীনগরে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় যখন আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম জম্মুর মানুষের মানসিকতা বুঝতে, তাদের মনে যে ভীতি ও

সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে তা দূর করার জন্য উদ্যোগ নিতে, আপনি এক কথায় আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আপনার বক্তব্য ছিল ঃ–

(১) প্রজাপরিষদের কোনও জনসমর্থন নেই।

(২) এর অতীত এতই কালো যে এর নেতাদের সঙ্গে আপনি মিশতে পারেন না।

আপনার প্রথম বক্তব্যটুকু এখন ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরিষদ আন্দোলন আরম্ভ করেছে এবং সেই আন্দোলন এখন বিস্তার লাভ করেছে যে আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন আছে সেটা প্রমানিত হয়েছে। যাই-ই হোক না কেন পরিষদ জনগণের বিভিন্ন অংশকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তারা যে এতটা জনসমর্থন পাবে এমনটা আপনিও কল্পনা করতে পারেন নি।

গণতান্ত্রিক নেতা হিসাবে আপনার বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি ও প্রভাবকে আপনার স্বীকার করা উচিৎ। পরিষদের তথাকথিত পূর্ব কর্মধারার জন্য আপনার তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গররাজী হওয়াটা ধোপে টেকে না। এই ধরনের মনোভাব যে শোচনীয় পরিণামদায়ক তা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কিংবা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কি হয়েছে একবার স্মরণ করা যাক্। বৃটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব চূর্ণ করতে এগিয়েছিল কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনায় না আসার প্রতিজ্ঞা যে বৃটিশ সরকার করেছিল, সেই দর্প কি চূর্ণ হয়নি? জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে যাদের দৃষ্টিভঙ্গী দেশপ্রেম থেকে দূরে ছিল সেই জিন্নার সঙ্গে গাঁধাজিও এবং অন্যান্য নেতারা নিজেদের নীতি বিসর্জন দিয়ে কী বোঝাপড়া করতে চাননি?

আপনার নিজের ক্ষেত্রে কি হয়েছে? যদিও আপনি আগে মহারাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু জাতীয় সংকটের সময় আপনি কি মহারাজার সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়ান নি? দেশ ও রাজ্যের মঙ্গলের জাতীয় সংকটের সময় কি আপনি মহারাজের কাছে আনুগত্যমূলক সহযোগিতা নিবেদন করেন নি? আপনি আরও লিখছেন, প্রজাপরিষদকে সমর্থন করছে এমন বহু দল ভারতের সংবিধানের বর্তমান আকার সম্বন্ধে খুশী নন। আপনি আরও বলেছেন- যে একজন প্রবক্তা বর্তমান জাতীয় পতাকার বদলে গৈরিক পতাকার জন্য লড়াই করবে। এই সব দলেরা আবার "এক বিধান, এক প্রধান ও এক নিশান" আন্দোলনও সমর্থন করছেন। আপনি সগর্বে ঘোষণা করলেন আপনি দিল্লী চুক্তির আংশিক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নতুন সর্দ্দার-ই-রিয়াসত পদটি সৃষ্টি করে। (একথা বলে রাখা ভালো যে শ্যামাপ্রসাদ ও প্রজাপরিষদ প্রথম থেকেই দিল্লী চুক্তির বিরোধী)।

আপনি আরও জানালেন যে প্রজাপরিষদের দাবী ও দিল্লী চুক্তি পরস্পর বিরোধী তাঁর ধারণা যদি দিল্লী চুক্তি বাতিল করতে হয় তবে সংবিধান সংশোধন প্রথমেই করতে হবে এবং তার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিশেষ অবস্থান বাতিল করতে হবে।

আপনি দিল্লী চুক্তি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর না হওয়ার বিস্তারিত কারণ দেখালেন। চুক্তি অনুযায়ী সর্দার-ই-রিয়াসত নির্বাচিত হবার পর জম্মুতে নামলেই তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে এবং আন্দোলন শুরু করে দেয়। সেজন্য সরকার পুরোপুরি আইন শৃঙ্খলা রাখতে ব্যর্থ এবং সংবিধান রচনার মনোনিবেশ করতে পারছে না।

আপনি আরও জানালেন গন্ডগোলটা দিল্লী চুক্তির ব্যাপার নয়। আমার মতে কাশ্মীরের সমস্যাটা কাশ্মীর ব্যাপারে কতকগুলি অস্পষ্টতা এবং প্রজাপরিষদ মুসলিম আধিপত্যের হাত থেকে জম্মুবাসীদের ভয়মুক্ত না করা পর্যন্ত তারা থামবে না।

কারণ গত দুমাস ধরে প্রজাপরিষদের সঙ্গে সরকারের সংঘর্ষ চলছে এবং এর ফলে সরকারের শিরপীড়ার কারণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনার আরও দাবী যে সরকার গভীর প্ররোচনার মুখেও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছে। তিনি আরও দাবী করেন একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে, পুলিশের সংখ্যা থেকে মিছিলকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল বলে তহশীলদার মেজিস্ট্রেট জীবন ও সম্পত্তি হানির আশঙ্কায় গুলি চালাতে বাধ্য হয়।

তিনি আরও বলেন যে আত্মরক্ষার জন্য এই গুলি চালানো যুক্তিযুক্ত, যদিও তারা দমন নীতিতে বিশ্বাস করেন না এবং জনসাধারণের জীবনের কোনও মূল সমস্যার সঙ্গে প্রজা পরিষদের আন্দোলন জড়িত নয়। তাই কর্তৃপক্ষ কোন শিথিলতা দেখাতে পারছে না।

জম্মুর মানুষের ক্ষোভ ও জম্মুর মানুষের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করার অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে অভিযোগের ঘটনাগুলি তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তিনি এগুলো নিয়ে আরও যত্নবান হবেন। তিনি শ্যামাপ্রসাদের কাছে একটি পুস্তিকা পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এই বইটা পড়ে শ্যামাপ্রসাদ লাভবান হবেন। তিনি জম্মুর সমস্যার জন্য প্রধান বিচারপতির একটি কমিশন গঠন করার কথা জানান।

তিনি সীমান্ত প্রদেশের গণভোটের প্রসঙ্গে বললেন যে পরিস্থিতিতে ওই প্রদেশকে পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, প্রদেশটিকে প্রথমেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিলো। তারপর লোকেদের বলা হয়েছিলো ভারত বা পাকিস্তান যেকোন একটি বেছে নিতে, প্রথমটি বেছে নেওয়া অসম্ভব।

কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারত ভাগের আগেই সেকুলার আদর্শ গ্রহণ করেছিল এবং সফলভাবে প্রতিরোধ তৈরী করেছিল। ১৯৪৭ সালের যথেচ্ছ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যখন পাকিস্তানী হানদাররা শ্রীনগরের দুয়ারে হাজির হয়েছিল তখন কাশ্মীরের মুসলমানরা তাদের সাহসী সন্তানদের উৎসর্গ করেছিল, সেকুলার ও মানবিক আদর্শবোধে প্রিয় আদর্শ রক্ষা করার জন্য এটা করেছিল, এমন সময়ে যখন তাহাদের সহধর্মীরা প্রজাপরিষদের সেই সব নেতাদের দ্বারা নৃশংশভাবে নিহত হচ্ছিল এবং আশ্চর্যের কথা তারা এখন দাবী করছে যে তারা ভারতের সেকুলার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসবান।

শেষে তিনি জানালেন যে ভারতের মুসলমানরা তাদের সেকুলার আদর্শ ত্যাগ করবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। বিরুদ্ধ পক্ষের অতীতের কলুষিত সম্পর্কটি মাত্র বিবেচনা করে বর্তমানের গভীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মনোভাব গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। আমি আপনার অতীত জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে কিছু জানি না। কিন্তু আমার কাছে কিছু কাগজপত্র আছে যে, আপনি নিজে একটি সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবেই জীবন শুরু করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু রাজার রাজত্বের অবসানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ অফিসাররা আপনার আন্দোলন ও আপনাকে ব্যবহার করার জন্য তাদের খোলাখুলি উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করেছে। তবুও আপনার বর্তমান লক্ষ্য বিচার করার জন্য, সেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনার অতীত জীবন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা অত্যন্ত অনুচিত।

আপনি হয়তো মহারাজার রাজত্ব সম্পর্কে বা অন্য কোনও লোকের আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে যাই বলুন না কেন, ঘটনা হচ্ছে এই মহারাজার আমলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন ভারতের বহু অংশ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলছে এবং সবরকম আবেগ তাড়িত বর্বরতার স্বীকার, তখন কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ওই সব আবেগ বিস্ফোরণ থেকে মুক্ত ছিল। ওই সময় রাজনৈতিক আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে চলছিল এবং ওই সময় আপনার প্রশাসনের উপর কোনও প্রভাব ছিল না।

১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এ সারা ভারতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার দায়িত্ব কোনও একটি দলের উপর বর্তায় না। এটা প্রামাণ্য যে ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং আমরা একটা ভয়ানক আবর্তের মধ্যে পড়ে যাই। সেই সব অধ্যায় আমাদের ভুলে যাওয়া দরকার শুধুমাত্র জাতির ও দেশের স্বার্থে। প্রত্যেকটি বিতর্ককে আমাদের গুণানুসারে বিচার করার সদিচ্ছা চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাধানের চেষ্টা আমাদের মূল পন্থার ভিত্তি হওয়া দরকার।

বিভিন্ন পরিস্থিতি আপনাকে রাজ্যটির ভাগ্য নিয়ন্তা করেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বসবাসকারী সকল শ্রেণীর মানুষের মনে বিশ্বাস ও দৃঢ়মনস্কতা গড়ে তুলতে পারতেন। ভুলে যাবেন না যে ডোগরারা কয়েক পুরুষ ধরে রাজ্যটি শাসন করে আসছে। যেই আপনি শাসন ক্ষমতায় এলেন তক্ষুণি অবস্থাটা হঠাৎ পালটে গেল। আপনি তখন নিজের পথ থেকে সরে গিয়ে মহারাজা সম্বন্ধে গালিগালাজপূর্ণ কথা বলছিলেন তখন সেটা আমরা কেউ পছন্দ করিনি। কারণ মহারাজার কর্ম ও সিদ্ধান্তের দোষের আপনি যখন পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তখন আপনি মহারাজাকে পূর্ণ সহযোগিতা ও বিশ্বস্ততার আশ্বাস প্রদান করেছিলেন।

আধুনিক পরিস্থিতিতে পুরুষানুক্রমিক শাসনের অযৌক্তিকতা ছাড়া যখন তিনি স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক ক্ষমতা ছেড়েছেন তখন ঐ মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

আপনার মানসিকতার জন্যই ডোগরাদের আক্রমণে পর্যবসিত হয়েছে। আমি নিশ্চিতভাবে এই ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম যাতে সমস্ত নাগরিকবৃন্দ আপনার শাসনে নিরাপদ থাকে। যাতে তাহারা এবং সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আপনাকে তাদের নেতা মেনে নেয়।

যখন আমি জম্মুতে ছিলাম তখন আপনারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনমানসের বিরূপতার তীব্রতা দেখেছিলাম। প্রবল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপনি যে রণ আহ্বান জানাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, একথা আমি সে-সময় স্বীকার করেছিলাম এবং আজও করছি। এ ব্যাপারে একটা বিশাল পরীক্ষা হয়েছিল যা ভারতের জাতীয় নেতারা সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারেননি এবং তাদের দুর্বল নীতির ফলে দেশ দু-টুকরো হয়েছিল। আপনার ঐ মহান কাজের জন্য আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে একান্তে সতর্ক করেছিলাম এবং এই কথা জনসমক্ষেও বলেছিলাম যে এই ব্যাপারে কাজকর্ম করার সময় আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবেন না, তুচ্ছ করবেন না জম্মুর বিশেষ সমস্যাকে।

একথা বলে রাখা ভালো যে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ফিরে আমি এই কথা শ্রীনেহেরুকে জানিয়েছিলাম। আপনারা দু'জনেই যদি ওই সময়ে ঠিক ঠিক এগোতেন তাহলে কিছুই ঘটত না।

বর্তমান আচলাবস্থা সম্বন্ধে আমার একটাই পরামর্শ আপনারা মিথ্যা অহমিকা নিয়ে কাজ করবেন না। বরং এই অবস্থাতেই প্রজাপরিষদের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী হন। আপনি যদি এটা করেন তখন কেউ আপনাকে দুর্বল বলে তিরস্কার করবেন না বরং সবাই আপনার রাজনৈতিক কর্মকুশলতার জন্য আপনাকে তারিফ করবে।

আপনার চিঠিতে নানা আইনী এবং সংবিধানগত দিক আছে। আমি সেগুলোরও গুরুত্ব খাটো করছি না এবং সেগুলি কোনও রকম বড় সমস্যা নয় বলে আমার মনে হয়। আপনি আপনার সমালোচকদের বিভিন্ন ভাষণ থেকে উৎকলিত করে তাদের ভাষণের সামঞ্জস্যহীনতা সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন। তার কিছু নেওয়া হয়েছে সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে এবং বাকীগুলি উৎকলিত হয়েছে প্রথম থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

এইভাবে যুক্তি পথে না এগিয়ে আপনি উল্টে আপনার নিজের ও আপনার রাজ্যের একটা আলাদা মর্যাদা সৃষ্টি করার প্রবণতা দেখাচ্ছেন। একজন নির্বাচিত রাজ্যপাল ও পৃথক পতাকার ব্যবস্থা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে, পতাকা হচ্ছে একতার চিহ্ন। বর্তমান পতাকায় গৈরিক নিশানে কতকগুলি বিরোধী নেতার এ ধরনের বক্তব্যের উল্লেখ, প্রদর্শন করছে যারা জম্মু ও কাশ্মীরের পৃথক পতাকার বিরোধিতা করছে, আপনি তাদের দৃষ্টিকোণ বুঝতে পারেন নি। কেউ বলেনি কোনও দলের অধিকৃত রাজ্যে গেরুয়া পতাকা ব্যবহৃত হবে, আর বাকী ভারতে চালু থাকবে বিভিন্ন ক্ষমতাশীল দলের ইচ্ছা অনুযায়ী এক বা একাধিক

পতাকা। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী যদি কোনও সময় জাতীয় পতাকার অদল বদল হয় তবে তা গোটা দেশের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হবে, এটা কোনও অনৈক্য সৃষ্টি করবে না। ক্ষমতাশীলদের ইচ্ছা অনুযায়ী যদি পৃথক পৃথক রাজ্যের পৃথক পতাকা চালু হয় তবে তারা ভারতের জাতীয় এবং রাজনৈতিক একতাকে বিনষ্ট করবে এবং আপনি এটাই করতে চলেছেন।

আপনি নিজেকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন। কেবলমাত্র একজনই প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন। তিনি সমস্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী, অন্য সমস্ত রাজ্যে প্রথম প্রশাসক নাগরিকটি মুখ্যমন্ত্রী বলে অভিহিত হোত। আপনার রাজ্যের প্রধান সরদার-ই-রিয়াসত (রাষ্ট্রপতি) নামে পরিচিত হবেন। ভারতে একজনই রাষ্ট্রপতি থাকবেন, তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি। অন্য রাজ্যের প্রধান-গভর্নর, রাজ প্রমুখ বা সংবিধানের নিয়ম আনুযায়ী যেকোন নামে অভিহিত হতে পারেন।

একটা প্রজাতন্ত্রের মধ্যে আর একটা প্রজাতন্ত্র থাকতে পারে না। একটি মাত্র একচ্ছত্র পার্লামেন্ট থাকতে পারে। সেটি ভারতের পার্লামেন্ট। জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাত সারে আপনি জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একচ্ছত্রতা সৃষ্টি করেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী ভারত ভাগ হয়েছে। আপনি এখানে ত্রি-জাতিতত্ত্ব উদ্ভাবন, তৃতীয়টি হচ্ছে কাশ্মীরী জাতি। এটা সাংঘাতিক তত্ত্ব এবং এটা ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেবে।

ভারতীয় সংবিধান কেন আপনার রাজ্যে প্রযুক্ত হবে না। এ বিষয়ে আপনার কোনও যুক্তিযুক্ত বক্তব্য আমার নজরে আসেনি। আপনার একমাত্র উত্তর, যদি এ ব্যাপারে কাশ্মীরের মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে যাবে। মুসলমানের মনে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও আত্মবিশ্বাসের আবহাওয়া গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করি না।

মুসলমানরা ভারতকে অবিশ্বাস করবে বার বার এই জুজুর ভয় দেখিয়ে এবং এটা যদি অবিরত চলতে থাকে তবে জিন্নার মনোভাবে যেমন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সে-রকম আবারও জটিলতা সৃষ্টি করবে। সারা ভারতে যদি ৮কোটি মুসলমান নিশ্চিন্তে থাকতে পারে তবে কাশ্মীরের ৩০ লাখ মুসলমান কেন নিরাপদে থাকতে পারবে না? কাশ্মীরের মুসলমানেরা তাদের নিজ রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদি না তাহারা বিশ্বাস করে যে তাদের ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের মতো একটা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

আমি চাই আপনি একজন কুশলী রাজনীতিকের মতো রাজ্যের সমস্ত অংশের বিশ্বাস অর্জন করে আমাদের হারানো ভূখণ্ড সমেত জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান হিসাবে কাজ করুন এবং রাজ্যটিকে ভারতীয় একতা ও স্বাধীনতার অগ্রগামী প্রতিপক্ষে পরিণত করুন। গত জুলাই মাসে শ্রীনেহেরুর সঙ্গে কৃত যুক্তি সম্বন্ধে আপনার যুক্তি খুব দুর্বল। চুক্তির চার মাস পরে আপনি সেই সব বিষয় যে সব অংশই কার্যকর করতে গেলেন যেগুলি সবই আপনার পছন্দমতো।

মূল প্রশ্ন যখন জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত ও অপরিবর্তন যোগ্য করা, যদিও আপনি ও শ্রীনেহেরু ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যটি ইতিমধ্যেই ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত এবং এ-ব্যাপারে কোনও বিতণ্ডা নেই এবং এই ব্যাপারে আমার সুচিন্তিত মত হলো জিনিসটাকে সংবিধানগতভাবে চূড়ান্তভাবে ঠিক করা এবং এটি যত তাড়াতাড়ি করা যায় সেটাই মঙ্গল। একথা বলা হয় যে রাজ্যটির জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রশ্নটির সমাধান হবে।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরে পাঁচশোর বেশী দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি কিংবা পাকিস্তানভুক্তি তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো। বৃটিশরা শুধুমাত্র অবিভক্তকে ভারত ও পাকিস্তানে ভাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা দেশীয় রাজাদের মনে "স্বাধীন" নামক মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে এবং আমার মনে হয় কংগ্রেস বাধ্য হয়েছিল এই ব্যবস্থাটা মেনে নিতে। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের কুশলতায় কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় বাদে সবগুলি রাজ্যের ভারতভুক্তি রক্তপাতহীন ভাবেই হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড়েরও ভারতভুক্তি হয়েছিল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওইসব রাজ্যের তত্ত্বগত ভাবে একই অধিকার ছিল আপনার রাজ্যের মতো। তাদের ভারতভুক্তি শুধুমাত্র যোগাযোগ প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতির ব্যাপারে নয় এবং অন্যান্য সর্বাধিক ব্যাপারেও এই ভাবেই দেশের জন্য একই সংববিধান গড়ে উঠেছে।

এখানে বলা ভালো পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আপনার রাজ্যে ভারতভুক্তি চূড়ান্ত হয়নি, এখন প্রশ্ন উঠছে আপনার রাজ্যের ব্যাপারটা সরকারীভাবে কীভাবে চূড়ান্ত হবে। আমার ব্যক্তিগত বাস্তব প্রস্তাব হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটধিকারের ভিত্তিতে আপনি যে গণপরিষদ গড়ে তুলেছেন তারাই এটা ঠিক করবে এবং ভারত তা মেনে নেবে। আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ প্রজাপরিষদ এই নির্বাচনের বৈধতা স্বীকার করতে রাজী নয়। আপনি ও নেহেরু ওই নির্বাচনের অবৈধতা অস্বীকার করেছিলেন। সুতরাং আপনি এখন দু'দিকের সুবিধা চাইতে পারেন না। আপনি এখন ক্ষমতার অধীশ্বর এবং গণপরিষদ পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক এই ভিত্তিতেই আপনি পুরো কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার বিরুদ্ধ পক্ষও ভারতভুক্তির ব্যাপারটা গণপরিষদে পাস করাতে চাইছে। এই ধরনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিজড়িত সকলের আশঙ্কা পাকিস্তান ও জাতিসংঘের মধ্যে থেকে উঠতে পারে, ওইখানে আমাদের বক্তব্য আমরা জাতিসংঘের কাছে গিয়েছিলাম পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই বিষয়ে। সুতরাং জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির ব্যাপারটা রাষ্ট্রসংঘের কাছে আদৌ বিচার্য নয়।

পরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ কোন্ বিষয়ে পূর্ণ ভারতভুক্তি ঘটবে? আপনার দাবী যেসব ধারা আপনাকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে যা অন্য রাজ্যকে দেওয়া হয়নি। আপনার দাবী যে-বাড়তি স্বাধীনতা আপনি ভোগ করুন। এ বিষয়ে প্রজা পরিষদের ও আমাদের বক্তব্য ঃ-

ভারতীয় সংবিধান গ্রহণ করুন এবং 'খ' অংশের রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রে যেগুলি প্রযোজ্য আছে, জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হোক, এই অনুরোধের মধ্যে কী সাম্প্রদায়িকতা বা

প্রতিক্রিয়াশীলতা আছে ? এমনকী এই ব্যাপারেও একটা বোঝাপড়ার সূত্র প্রদান করছি এবং যেটা কোনও একজনের কাছে কেন গ্রহণযোগ্য হবে না আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

সংবিধানের কিছু মূল ব্যবস্থা আছে যেগুলো পুরো ভারতের পক্ষে প্রযুক্ত হওয়া দরকার এবং এগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল কথা। এগুলি মৌলিক অধিকার নাগরিকত্ব, সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা, প্রবেশ কর বিলোপ সমেত গোটা অর্থনীতির একীকরণ নির্বাচন পরিচালনা ও জাতীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। এ-সবগুলোর ব্যাপারে অক্ষুণ্ণভাবে কিংবা পরিবর্তিভাবে আপনি মেনে নিয়েছেন। অনুগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আপনি গ্রহণ করুন এবং বিস্তারিত স্মারকলিপি প্রস্তুত করুন এবং তাতে আপনি দেখান কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনি ভারতীয় সংবিধানের ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইছেন। সেগুলি যে আপনার রাজ্যের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ভারতের একতা ও সংহতির পরিপন্থী নয় আপনাকে প্রতিপন্ন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার প্রস্তাবগুলি নিস্পৃহভাবে বিবেচনা করা হবে এবং পারস্পরিক আলোচনার পরে গুণানুসারে গৃহীত হতে পারে।

আপনার কার্যকলাপ বিস্তর বিরোধিতার সৃষ্টি করলো। এই কারণে ব্যবস্থাগুলি রাজ্যটিকে ভারতীয় সংবিধান থেকে দূরে সরিয়ে দিল। চুক্তির অন্য অংশগুলির রূপায়ণে কি বাধা সেটা আমার বোধগম্য নয়। যদি কিছু বিধিগত ব্যাপার এখনও বাকী থাকে তাহলে আপনি সহজেই ২-৩ মাস অপেক্ষা করতে পারতেন। আপনি বলছেন যেহেতু আমরা চুক্তিটি পছন্দ করিনি তাই এই চুক্তি রূপায়িত হোক বা না হোক আমাদের কিছু আসে যায় না। এটা একটা সস্তা যুক্তি এবং সমস্যা সমাধানের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমরা মনে করি ভারতীয় সংবিধানের কিছু কিছু ব্যবস্থা জম্মু ও কাশ্মীরে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও উন্নত এবং বৃদ্ধি করা যায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের উপর অত্যাচারের ও বাড়াবাড়ির গুরুতর সংবাদ পাচ্ছি। প্রত্যেকটি সংবাদের সত্যতা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি দায়িত্বশীল লোক নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল জম্মুতে পাঠাতে চেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে তিনজন বিধায়ক কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের আপনারা রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি দেননি। বিশেষ অনুমতি ছাড়া ভারতের একটা অংশের নাগরিক অন্য অংশে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি আবার বলছি দমন, বুলেট, জেল এই সমস্যার সমাধান নয়। আন্দোলন গভীরভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাড়ছে তিক্ততা আর ঘৃণা। আমার স্থির বিশ্বাস এই আন্দোলন জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ আপনি ও একমাত্র আপনাকেই এই আন্দোলনের মূল কারণ অনুসন্ধান ও তা প্রশমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনার প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমি বিস্তারিতভাবে কিছু উল্লেখ করিনি কারণ সেগুলি অর্থনৈতিক ব্যাপার। এর মধ্যে আছে পুনর্বাসন, বিভেদমূলক নীতি ইত্যাদি। সীমান্ত জেলাগুলোর পুনর্বিন্যাস নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করছে।

আপনি আপনার প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেকোন অভিযোগের তদন্তের জন্য সদা প্রস্তুত আছেন।

আমরা আশা করবো তদন্ত কমিশনের সভ্যরা প্রশাসন মুক্ত হবে এবং এর পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়া দরকার।

আপনার রাজ্যের সংবিধানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিনি। তবে জম্মু ও লাডাখের এবং কাশ্মীরের ব্যাপারে স্বশাসনের যৌক্তিকতা নিয়ে বিশদভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে আশু কর্তব্য হচ্ছে, আন্দোলন প্রশমিত করার কারণ আমরা চাই আন্দোলনের দ্রুত অবসান এবং এ বিষয়ে যদি এখন যা দরকার তা হলো অন্দোলনের দ্রুত অবসান এবং ভবিষ্যতে সহযোগিতার জন্য যথাযথ পরিমণ্ডল সৃষ্টি।

আমি সাহায্য করতে পারি, তবে পূর্ব তিক্ততা ভুলে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার সহকারী হবো। অন্যের হস্তক্ষেপের চেয়ে ভালো হবে যদি আপনি ও নেহেরু উপস্থিত থেকে, জম্মুর প্রতিনিধিদের একটি মিটিং ডাকেন। এই সম্পর্কে গতকালের চিঠিটা দেখুন। আমাদের একমত না হওয়ার কোন কারণ নেই। যদি আমরা একত্র হই তবেই আমরা শত্রু করতলগত রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের ভূমি পুনরুদ্ধার করতে পারবো। এ বিষয়ে অগ্রগামীর ভূমিকা নেওয়া উচিৎ, আপনার ও নেহেরুর। বৃটিশ শাসন অনুকরণ করবেন না এবং মিথ্যা অহঙ্কার নিয়ে পড়ে থাকবেন না। এই আমার অনুরোধ। আসুন আমরা সকলে সাহায্য ও বোঝা-পড়ার মাধ্যমে এই জাতীয় সম্পর্ক দ্রুত তৈরি করি।

আপনার বিশ্বস্ত

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৮ ফেব্রুয়ারি জম্মু তাওয়াই থেকে আব্দুল্লা শ্যামাপ্রসাদের চিঠির উত্তর দিলেন। তিনি অভিযোগ করলেন শ্যামাপ্রসাদ তার দৃষ্টিভঙ্গী যথাযথ উপলব্ধি করেন নি। তার বিশ্বাস কতকগুলি মূল নীতি গোটা সমস্যার সঙ্গে জড়িত সেগুলি জানা প্রয়োজন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধে আপত্তির কারণ এই নয় যে এর ফলে মুসলমানরা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকবে। তারা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং শ্যামাপ্রসাদ যে জন্য প্রশংসা করেছেন এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

তিনি প্রশ্ন রাখলেন এক শ্রেণীর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে ধিক্কার দেওয়ার জন্য আমি সন্দেহভাজন হবো কেন? বললেন সাম্প্রদায়িকতা এক শ্রেণীর জন্য ভালো, আবার অন্য শ্রেণীর জন্য খারাপ তা হতে পারে না।

সুতরাং আপনি যখন চিন্তা করেন জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভূক্তির জন্য সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। আপনার তথাকথিত একচ্ছত্র ক্ষমতার উৎসটি যাই হোক না কেন, ক্ষমতা আছে এবং আপনারা খুশীমতো তার ব্যবহার করছেন। এখানে আপনাকে অনুরোধ করবো

পুরোপুরি আইনগত অবস্থান গ্রহণ করবেন না। আপনি আগে ভারতীয় পরে অন্য কিছু। আমাদের সেই ভাব নিয়ে বিষয়টি চিন্তা করা হোক এবং ভেঙ্গে দেওয়া হউক বৃটিশ সরকারের অনৈক্যের অভিসন্ধিকে।

আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে আর একটা বন্ধন এনেছে। ভুলে যাবেন না আমাদের জওয়ানরা ভারতের ওই অংশ শত্রুদের নিষ্ঠুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একইসঙ্গে রক্ত ঝরিয়েছে।

আমার অনুরোধ ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করেও রাজ্যটির কল্যানের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় এবং ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা রাজ্যটি শাসিত হতে রাজী হবেন। সাংবিধানিক কচকচানি বাদ দিলেও, আমি বুঝতে পারছি না সম্পূর্ণ ভারতভুক্তি দ্বারা সমস্যা সমাধানের এই পথ আপনার কাছে অন্যায় বা অসমীচিন মনে হচ্ছে কেন।

জম্মুর লোকেরা এই দাবীই জানাচ্ছে এবং প্রজাপরিষদ এই দাবীর ভিত্তিতেই আন্দোলন করছে। আপনার প্রচেষ্টা হওয়া উচিৎ তাদের ভয় ও সন্দেহ অনুধাবন করা, তাই বলি কোনও রূপ সন্দেহ পোষণ না করে এবং সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন না তুলে একটা সমাধানে পৌঁছানো।

জাতিসংঘ প্রসঙ্গ ও গণভোট প্রসঙ্গ ঃ- আমি মনে করি কাশ্মীর প্রসঙ্গ জাতিসংঘ থেকে বের করে আনা উচিৎ। আমরা ওখানে গিয়েছিলাম পাকিস্তানে আগ্রাসনের জন্য। ভারত ভুক্তির জন্য নয়।

সঙ্গতকারণেই আমাদের সেখান থেকে কোনও সহানুভূতি ও সাহায্য প্রত্যাশা করা উচিৎ নয়। নিঃসন্দেহে ভারত ওখানে গণভোটের আশ্বাস দিয়েছে। ভারতভুক্তি জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ীই হবে। এই ঘোষণা থেকে আমাদের স্থির থাকা দরকার, কিন্তু যতদিন রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের অধিকারে থাকবে ততদিন সাধারণ গণভোটের প্রশ্নই নেই।

আমরা যখন দাবী করি আমাদের রাজ্যের গণপরিষদে একটা প্রস্তাব পাশের দ্বারা জনগণের ইচ্ছার চূড়ান্ত প্রতিফলন জানা যাবে। তখন আমি শুধু একটা পদ্ধতির উল্লেখ করছি, যা নিয়ে কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা প্রশ্ন তুলবে না এবং পণ্ডিত নেহেরু তার শেষ চিঠিতে বলেছেন, এই ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই।

এখন প্রশ্ন থাকে এই ব্যবস্থা পাকিস্তান ও জাতিসংঘের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে? হারিয়ে যাওয়া ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ স্থির হবে এবং যদি আদৌ হয়, আমরা যখন জায়গাটির পুনর্দখল করতে পারবো বা পাকিস্তান জায়গাটা ছেড়ে দেবে। ভারতভুক্তির প্রশ্ন যখন চূড়ান্ত হয়ে যাবে তখন জম্মুর লোকেরা চাপমুক্ত মনে করবে এবং দূরীভূত হয়ে যাবে তাদের মূল ভয় বা সন্দেহ। জম্মুর মানুষেরা বা আমি চাই যে জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে আলাদা হয়ে যাক, এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়।

কাশ্মীর উপত্যকাকে একটি আলাদা রাজ্য বানানো ঃ— অবশ্য একটা সম্ভাব্য সমাধান

হচ্ছে, কাশ্মীর উপত্যকাকে একটা আলাদা রাজ্য বানানো এবং তার উন্নতির যা দরকার তা দেওয়া। সেটি তখনও ভারতীয় ইউনিয়নের একটি একক হিসাবে কাজ করবে এবং সংবিধানের বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারেই চলবে। আমি কোনও আনন্দের সঙ্গে বিকল্প প্রস্তাব করিনি। যদি কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না পাওয়া গেলে এটা অনিবার্য হয়ে উঠবে ফলে আমি মনে করছি। আমরা সবাই চাইব একটি সংহত জম্মু ও কাশ্মীর নিয়েই।

প্রজাপরিষদ চায় আমাদের রাজ্য অন্যান্য 'খ' তালিকাভুক্তি রাজ্যের মতো ভারতীয় সংবিধান অনুসরণ করুক। এখানেও আমি বলেছি কোনও কিছু অলঙ্ঘ্য নয়। সংবিধানের এমন কিছু ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হওয়া দরকার, তাহলে তা আপনি প্রস্তাব করুন। নিঃসন্দেহে পার্লামেন্ট ও অন্য সকলে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

কিছু কিছু ব্যাপারে ভারতের সংহতি বজায় রাখতে হবেই। এবং এই ব্যাপারগুলো হল মৌলিক অধিকার নাগরিকত্ব, সুপ্রীম কোর্ট, রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ঐক্য ও নির্বাচন পরিচালনা। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এর মধ্যে ভুল প্রতিক্রিয়াশীল বা সাম্প্রদায়িক কিছু আছে?

আপনি বলেছেন ভারতভুক্তি বা ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের মধ্যে কোনও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নেই? আমি জানতে পারি কারা এই প্রস্তাবে আপত্তি করছে? নিঃসন্দেহে রাজ্যের অমুসলমানরা নয়। আর বর্তমান সংবিধানে মুসলমানদের ভয়টা কী সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেন কি?

বাকী থাকে রাজ্যের প্রধান ও পতাকা ঘটিত প্রশ্ন ঃ- এই ব্যাপারে আপনার রাজ্যে আলাদা ব্যবস্থা কেন থাকবে তার কোনও কারণ খুঁজে পায় না। আপনি গণপরিষদের কার্যবিবরণী দেখতে পারেন।

তাতে নির্বাচিত রাজ্য প্রধানের বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহেরুর একটা যুক্তি আছে। নির্বাচিত প্রধানের ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীল দল অবশ্যই কোনও একজনকে নির্বাচিত করবে এবং তিনি সম্ভবত একজন দলীয় লোক হবেন এবং হবেন রাজ্যেরই অধিবাসী।

এটা সকলের দ্বারা স্বীকৃত যে রাজ্যের প্রধান হবেন একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর মনোনয়নের জন্য তিনি রাজ্যের ক্ষমতাশীল দলের কৃপার জন্য ঋণী থাকবেন না। আবার জরুরী অবস্থার সময় তাকে রাষ্ট্রপতির হয়ে কাজ করতে হতে পারে। তিনি যদি দলীয় লোক হন এবং জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে তিনি ও রাষ্ট্রপতি দুজনেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে পারেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা রাজ্যের প্রধান নিয়োগ সমর্থনীয় এই যুক্তিতে যে রাজ্যের প্রধান ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে একটা সাধারণ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে। আপনার দাবী মানার জন্য এই নিয়মের প্রতিকার করতে হবে। সর্দার-ই-রিয়াসত নাম সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা বক্তব্য যে সকল রাজ্যের জন্য কেন একটি সাধারণ নাম, তা যাই হোক না কেন, গৃহীত

হবে না। প্রত্যেক রাজ্যের জন্য যদি আলাদা আলাদা নামকরণ থাকে তবে তাহা এক জিনিসকে অন্য জিনিসে ভুল করার প্রবণতা থাকবে।

পতাকার ব্যাপারে আপনার কী ভারতে প্রযুক্ত একই পতাকা গ্রহণ নিঃসন্দেহে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবে এবং আশা করি আপনি ভারতীয় পতাকা ব্যবহার করবেন। একমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকার সহিত রাজ্যের পতাকাও ব্যবহৃত হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে গৈরিক পতাকা সম্বন্ধে আপনার বিরাগের কারণটা বুঝতে পারলাম না।

গৈরিক পতাকার কোনও সাম্প্রদায়িক অর্থ নেই। গৈরিক রঙ রক্ত বিশুদ্ধতা, ত্যাগ ও সেবার প্রতীক। বহু সহস্রাব্দ ধরে এটাই স্বাধীন ভারতের পতাকার রঙ। ভারতের এই রঙ গ্রহণের আশু সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে আপনি এটাকে আগ্রসী হিন্দুধর্মের প্রকাশ বলে ভেবেছেন। ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ কি ভারত তার অতীত ইতিহাস ও পরম্পরাকে বাদ দেবে? আপনার পতাকার রঙ লাল উপরে একটা চিহ্ন থাকা দু'মুখ সমালোচক যদি বলে যে একটা কমিউনিষ্ট পতাকা, একটু গোপন করে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রার্থনা করি আমরা যেন বর্ণান্ধ না হই।

আগের চিঠিতে মহারাজ সম্বন্ধে যা বলেছি তা আপনি ভুল বুঝেছেন। আমি মহারাজাকে ভালো করে চিনি না। কোনও একটি সভায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি মহারাজের হয়ে ওকালতি করছি না এবং আধুনিক ব্যবস্থায় ভারতের কোন অংশে কোনও বংশানুক্রমিক প্রশাসনের স্থান আছে বলে আমি মনে করি না। আপনি মহারাজাকে বড় বিবর্ণ করে এঁকেছেন কিন্তু এই মহারাজই ২০ বছর আগে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে নিজের অবস্থান থেকে বেরিয়ে বৃটিশদের বলেছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে।

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাশ্মীরিরা ভারতকে বেছে নিয়েছিল, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল গাঁধীজির ভারত, ভারতের বেশীরভাগই অসাম্প্রদায়িক। এজন্যই তারা তাদের ভাগ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। তিনি আবেগময় ভাষায় আরও লিখলেন যে ভারত যদি কোনও সময় ভুল করে এবং তাদের আদর্শ ত্যাগ করে, তিনি নিঃসন্দেহ যে কাশ্মীরের লোকেরা সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকবে না।

কৌশলে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন ভারতে বিভক্ত মতামত তাদের অপরিহার্য মানবিক আকুতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভারতের গণপরিষদ তাদের ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ দিয়েছে। তিনি আরও মন্তব্য করলেন যে একে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। তিনি আরও বললেন যে তারা দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, তার মত, সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে কাঠামোর মধ্যে থাকার ইচ্ছা নেই বলেই তারা ভারতে যোগদান করেছেন।

কিন্তু তিনি সুচতুরভাবে কাশ্মীরের আভ্যন্তরীন স্বাধীনতা সংক্ষেপ করার জন্য শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব রাজ্যকে দেওয়া সুযোগগুলিকে অস্বীকার করায় পর্যবসিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ৩৭০ ধারা প্রবর্তন সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের উক্তির উৎকলিত করে ওই ধারার যৌক্তিকতার প্রমাণের জন্য উৎসুক হলেন তিনি। (সর্দার প্যাটেল এই পত্র বিনিময়ের সময় জীবিত ছিলেন এবং ৩৭০ ধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন।)

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার যে বিশেষ সমস্যার মোকাবিলা করছে তার রাজ্যের সঙ্গে ইউনিয়নের সম্পর্ক বর্তমানের ভিত্তিতে বজায় রাখার জন্য আমরা সংবিধানে বিশেষে ব্যবস্থা রাখছি। তিনি আরও জানালেন চাপ বা বলপ্রয়োগ করে একটা স্পর্শকাতর সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

শ্যামাপ্রসাদের উচ্চারিত ত্রি-জাতি-তত্ত্বের ব্যাপারে তিনি জানালেন আমাদের সিদ্ধান্ত ভারতের একতার প্রতিকূল নয়। যেহেতু আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত ভারতীয় সংবিধান থেকেই বিস্তৃত।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নীতি আমাদের রাজ্যের বিচিত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের জন্য। জম্মু ও কাশ্মীরের সর্দার-ই-রিয়াসত নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি জানালেন যে অন্যান্য রাজ্যে গভর্নর রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই নির্বাচন করা হয়। আমরা এই অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি যখন অন্যান্য রাজ্যে গভর্নর রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই নির্বাচন করা হয়। আমরা এই অধিকারের প্রসারণ করেছি মাত্র।

সর্দার-ই-রিয়াসত নাম প্রসঙ্গে তিনি জানালেন আপনি যখন ইংরেজী গভর্নর নামটা পছন্দ না করেন তখন হিন্দুস্থানী ভাষায় সর্দার-ই-রিয়াসত নামটার কেন আপত্তি বুঝতে পারলাম না।

প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে জানান, আমাদের একচ্ছত্র অধিকার নেই, একচ্ছত্র পার্লামেন্ট দ্বারাই সংরক্ষিত।

গেরুয়া ঝাণ্ডা প্রসঙ্গে শেখ আব্দুল্লা বিরক্তির সঙ্গে লিখলেন- আপনি লিখেছেন গোটা দেশ যদি গেরুয়া ঝাণ্ডা গ্রহণ করে তবে আপত্তির কিছু নেই। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দেশে জয়যুক্ত হলে তা হবে এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার। কাশ্মীরের মানুষরা গাঁধীজির আদর্শের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। তিনি আবেগময় ভাষায় লিখলেন যে জাতির জনক তাঁর জীবন বৃথা বলিদান দেননি। তাঁর মহৎ বলিদান আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।

তিনি আরও অভিযোগ করলেন যে প্রজাপরিষদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যোগাযোগের কথা বলেন নি। তিনি লিখলেন ১৯৪৭ সালে জম্মুতে সংঘ নেতাদের কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত এবং আমরা সেই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে বাধা দিচ্ছি। আমি স্বীকার করছি এই ব্যথা ভরা পরিচ্ছেদ ভুলে যাওয়া উচিৎ। তিনি আরও বলেন যখন গাঁধীজির হত্যার পর

সংঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয় তখন তারা প্রজাপরিষদের পতাকা তলে উদ্ভুত হয়। একই কার্যক্রম ও একই নেতৃত্ব নিয়ে।

প্রজাপরিষদ সম্বন্ধে আমার ধারণা পূর্ব সংস্কার মুক্ত নয়। আমি নিঃসন্দেহ যে এর নেতৃত্ব দেশটাকে ভাঙ্গনের পথে নিয়ে যাবে।

তিনি শুধালেন প্রজাপরিষদের অতীত ও বর্তমান কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে সরকারের সঙ্গে তাদের নেতৃত্ব বৈঠকের বাতাবরণ তৈরী হতে পারে?

তিনি দৃঢ়ভাবে জানালেন আমাদের পক্ষে এই সংস্থাকে স্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি আরও জানালেন আমরা ডোগরাদের আক্রমণ করি, এ ধরনের অভিযোগ অন্যায়।

তার মহারাজা বিরোধিতা প্রসঙ্গে বললেন, যুদ্ধটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় এবং তিনি মহারাজাকে রাজ্যের জটিলতার জন্য সরাসরি দায়ী করলেন। তার আরও অভিযোগ গাঁধীজি, সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল এবং তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকৃপালনীজি প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতারা ভারত ও কাশ্মীরের বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজা রাজ্যটির দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে কোনও রকম সমঝোতা করতে না চাওয়ায় তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। মহারাজা ঐ সব ক্রান্তিকারী দিনগুলিতে একদল বিদেশী দ্বারা প্রভাবিত এবং উপদেশিত হচ্ছিলেন এবং যাদের রাজ্যটির ব্যাপারে বিশেষ চক্রান্ত ছিল। তিনি ঐ প্রসঙ্গে কোহলায় জওহরলালের গ্রেফতারের প্রসঙ্গও তুললেন।

তিনি অভিযোগ করলেন যে মহারাজা রাজ্য আক্রমণের মোকাবিলা না করে জম্মুতে পালিয়ে গেছিলেন এবং পরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এজন্যই রাজ্যে তখন সংঙ্কটময় অবস্থা তৈরী হয়েছিল। তিনি দাবী করলেন জম্মুর অধিবাসীদের সঙ্গে কোনও বিভেদমূলক আচরণ করা হয়নি। প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও কোনও সাম্প্রদায়িক ও বা প্রাদেশিক বিবেচনা হতে দেননি।

দিল্লী চুক্তি সম্বন্ধে শেখ আব্দুল্লা জানালেন চুক্তির পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না এবং বললেন চুক্তির শর্তগুলি যথা সময়ে কার্যকর করা হবে। তিনি প্রশ্ন তুললেন ১১ ফেব্রুয়ারি আপনি জওহরলালের দিল্লী চুক্তি বাতিল করতে বলেছেন, আবার আমাকে চুক্তি কার্যকর করতে দেরী করার জন্য বলেছেন। চিঠিতে এরকম স্ববিরোধিতা কেন? তদন্ত কমিশন প্রসঙ্গে তিনি বললেন– যে প্রধান বিচারপতি নিরপেক্ষ নন, একথা বলা যেকোন রাজ্যের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে।

শেষ চিঠি

৩০, তুঘলক ক্রিসেন্ট
নয়া দিল্লী ২৩.২.৫৩

প্রিয় শেখ সাহেব,

আপনার ১৮ ফেব্রুয়ারির চিঠির জন্য ধন্যবাদ এবং ওটা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। স্বাভাবিকভাবে শুধু লিখতে আমি একদম আগ্রহী নই। এখানে বলে রাখা ভালো যে আপনার পুরো তত্ত্বটায় মূল ভিত্তি হল ১৯৪৭ সালের আইনী গল্প করেন, ওই বৃটিশ সরকার যখন দেশটা দু-টুকরো করার কথা ঠিক করলো এবং ৫০০ মতো দেশীয় রাজ্যকে স্বাধীনতা দেবে তখন বৃটিশ রাজ্যের সবটুকু, উত্তরাধিকারী সরকারের উপর বর্তানো উচিৎ ছিলো। কিন্তু বৃটিশ সরকারেরপরিকল্পনা কংগ্রেস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। বৃটিশ পরিকল্পনায় তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ-

(১) বৃটিশ অধিরাজত্বের (Paramountcy) অবসান এবং এটার যত রকম অর্থ হয়।

(২) দেশীয় রাজ্যগুলি এ-ভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং ভারতভুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পুরোপুরি অধিকার তাদের হাতে থাকবে।

(৩) ভারতভুক্তি হবে মাত্র তিনটি বিষয়ে (ক) বৈদেশিক সম্পর্ক, (খ) প্রতিরক্ষা, (গ) যোগাযোগ। অন্য বিষয়ে তাদের সম্মতি ছাড়া কিছু করা যাবে না। এটা জলের মতো স্বচ্ছ যে এই সমস্ত কিছুর পেছনে একটাই মাত্র উদ্দেশ্য কাজ করছিল এবং সেটা হল এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে নবীন ভারতের সরকার একটি সংহত ও শক্তিশালী ভারতে পরিণত না হতে পারে। বলতে গেলে যখন বৃটিশরা ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন বৃটিশ ইংরেজ রাজত্বের সবটুকু ভারতের উপর বর্তানো উচিৎ ছিলো। নবগঠিত পাকিস্তান সরকারের এবিষয়ে কোনও বক্তব্য থাকতে পারে না।

আপনি হায়দ্রাবাদের ও জুনাগড়ের ইতিহাস জানেন এবং দেশের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তাহারাও বাকী ৪৯৭ টি রাজ্যের মতো ভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে, তারা আজ ভারতের অপ্রত্যাবর্তন যোগ্য একক। জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাপারে এটা করা যায়নি, যেহেতু ততদিনে যুদ্ধ বেধে গেল। এর মধ্যে ভারতের সংবিধান চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ফলে যে পদ্ধতিতে অন্য সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে ভারতভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হল না। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে অন্য একটি ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে স্থান পেলো। সেই জন্যই ৩৭০ ধারার জন্ম কাহিনী। শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার গণপরিষদে ৩৭০ ধারার ব্যবস্থা করার সময় বলেছিলেন যে এটা একটা তৎকালীন ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে যেভাবে অন্য সব রাজ্যে হয়েছে।

এটা ঐতিহাসিক সত্য। যে এই ঘটনার পরে ভারতের শাসকদলের চোখের বালি হয়ে উঠেছিলেন এই মহারাজা। তিনি হয়েতো মারাত্মক ভুল করে থাকতে পারেন, কিন্তু লিখিতভাবে তাঁহার শেষ কাজ আপনার ও ভারত সরকারের মূল উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়েছে। শহর আক্রমনের আগে শ্রীনগর আক্রমণের আগেই ভারতভুক্তির কাগজপত্র সই করেছিলেন, আপনি লিখেছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি শ্রীনগর ছেড়েছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ও অন্যান্য নেতাদের নির্দেশে।

একটা স্পষ্ট কারণ হচ্ছে কিছু কাগজপত্রের কাজ চূড়ান্ত করার জন্য তার স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল। শ্রীনগরের পতন হলে কিংবা তিনি গ্রেপ্তার হলে এগুলি কিছুতেই সংগ্রহ করা যেত না। আপনি এটা জানেন না এটা ভাবা অসম্ভব। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে আপনি কী মহারাজাকে জানাননি যে আপনি ও আপনার দল তাঁর সিংহাসন ও তাঁর রাজবংশের প্রতি কোন অবিশ্বস্ততার ভাব পোষণ করেন নি।

১৯৪৮ সালের মার্চে যখন আপনাকে সরকারের ভার নিতে বলা হয়েছিল, তখন মহারাজার পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা মহামূল্য জ্ঞান করে এবং মহারাজার ক্ষমতা প্রত্যার্পণের মহানুভবতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনি মহারাজকে চিঠি লিখেন নি। একথা বলা ভালো যে ১৯৪৮ সালের পর থেকে তিনি শুধু একটা রাবার স্ট্যাম্প, তারপরে আপনি ও ভারত সরকার যা করাতে চাইছেন তিনি তাই করে গেছেন। তারপরে তিনি নিশ্চয়ই কোন আশ্চর্য কিংবা খারাপ কাজ করেন নি নিশ্চয়ই।

রাজার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ঃ- আপনি ব্যক্তি মহারাজার প্রতি রাজ সিংহাসনের প্রতি এবং রাজবংশের প্রতি সম ত রকমের বিশ্বস্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারত সরকারের পূর্ণ সমর্থনে তাকে বহিষ্কৃত করার পূর্ণ সুযোগটি আপনি গ্রহণ করলেন।

মহারাজা চলে গেছে এবং বর্তমান আন্দোলনের লক্ষ্য মহারাজের পুনরুদ্ধার নয়। এর লক্ষ্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষ যেন পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করে এবং সংখ্যালঘুরা যেন নির্ভয়ে এবং সমানাধিকারের সঙ্গে রাজ্যে বাস করতে পারে। ভারতে কোনও স্থানে মহারাজদের একনায়ক আর নেই। যেখানে তাঁরা কাজ করেছেন শুধু সংবিধানক প্রধান হিসাবে।

তদন্ত কমিশন ঃ- তদন্ত কমিশনের গঠন সম্পর্কে আমার মন্তব্য আপনি বুঝতে পারেন নি। প্রধান বিচারপতির চরিত্র সততা সম্বন্ধে আমি কোনও কটাক্ষ করিনি। আমি তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না, কিন্তু বিশ্বাস করি তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজের কর্তব্য সম্পাদনে সমস্ত প্রজাদের উর্দ্ধে। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরুকে যেমন লিখেছি যে কমিশনের অন্যান্য সভ্যরা আপনার অধীনস্থ সরকারী কর্মচারী এবং তাদের চিনি না। অনুমান করি তাঁরা উপযুক্ত এবং নিজের কর্তব্য সম্পাদনে সৎ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা কি সরকারের নীতি ও প্রশাসন সম্পর্কে বিচার করতে পারবেন?

ভারতের অন্যান্য অংশে যখনই এই ধরনের বিতণ্ডা সৃষ্টি হয় তখন তদন্ত কমিশন গঠিত হয় শুধুমাত্র জজদের দ্বারা বা কমিশনের বেশীরভাগ সদস্যই নেওয়া হয় বিচার বিভাগ থেকে, এটা কারও প্রতি কটাক্ষ নয়, সেজন্য আমি নেহেরুর কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম যে তিনি যেন আপনাকে অনুরোধ করেন তদন্ত কমিশন পুনর্গঠন করার জন্য এবং সেই কমিশনে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে দু'জন বিচারপতি থাকেন।

রণে আহ্বান করা নয় ঃ- এটা কি আপনার কর্তৃত্বকে রণে-আহ্বান করা, না আপনার বিচারপতিকে দোষারোপ করা। ভারতীয় পুলিশ দিয়ে আপনার নাগরিকদের পেটাতে আপনার স্বশাসনে আঘাত লাগছে না, তখন কয়েকজন ভারতীয় বিচারককে নিয়োগ আপনি রণে আহ্বান ভাবছেন কেন?

কুড়ি বছর আগের ঘটনা ঃ— তৎ সময় একটি গুরুতর মারদাঙ্গা ও গণ্ডগোলের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য মহারাজ যখন একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন, তখন আপনি কি করেছিলেন? আপনি কি ঐ তদন্ত কমিশনের সঙ্গে অসহাযোগিতা করেন নি, আপনিই এখন রাজ্যের সর্বময় কর্তা এবং যারা আপনার সরকারী নীতির সঙ্গে একমত নয় এবং যারা নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্তের জন্য ব্যগ্র, তাদের ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখছেন কেন?

প্রজাপরিষদের নেতাদের সঙ্গে বাক্যালাপ নয় কেন? প্রজাপরিষদের প্রতিনিধিদের আপনার বাক্যালাপের অসম্মতির কারণ আমি অনুধাবন করতে পারছি না। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এই আন্দোলনটি প্রথমে প্রত্যাহার হবে। তারপরে একটি বৈঠক হবে যাতে, আপনি, নেহেরু ও প্রজাপরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে, এতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে সমস্ত সন্দেহ ভয় দূর করা এবং একটা শান্তি ও শুভেচ্ছার বাতাবরণ তৈরী করা, বন্দীদের মুক্ত করা হবে। প্রত্যাহৃত হবে সমস্ত বাজেয়াপ্তকরণ ও অন্যান্য আদেশ। তদন্ত কমিশন পুনর্গঠিত হবে। অর্থনৈতিক ও প্রশানিক ব্যাপার সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষোভের বিচার করবে এই কমিশন। সমস্ত পক্ষকে নিয়ে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হবে যাতে সহযোগিতায় রাজ্যটি গড়ে উঠতে পারে। সমস্যা মেটানোর পরে জুলাই চুক্তি কার্যকর করতে আমি আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করছি, সমস্যা সমাধানের এই পথ কি প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক এবং বিশ্বাসঘাকতাময় বলে অভিহিত হবে?

প্রজাপরিষদের সঙ্গে বৈরীতা ঃ- প্রজাপরিষদের কথার ভিত্তিতে এবং তারা যে সমস্যার কথা তুলছে তার ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন না কেন? আন্দোলনটা এখন আর তাদের সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। জনগণের মনোযোগ এখন এই আন্দোলনের দিকে নিয়োজিত হয়েছে এবং আপনি বলপ্রয়োগ করে এই আন্দোলন বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনি গাঁধীবাদ ও গাঁধীপন্থার কথা বলেন। কিন্তু যখন সঙ্কট উপস্থিত হয় আপনার

অহিংসার মুখোশটা খুলে পড়ে, তারপরে বেরিয়ে পড়ে আপনার মুখোশের আড়ালে আপনার প্রকৃত মুখ, তখন আপনার অহিংসার অস্ত্র হয় ভীতিপ্রদর্শন আর গালাগালি, জেল আর বাজেয়াপ্তকরণ, বেয়নেট, আর বুলেট। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি এতটাই বেয়াড়া যেকোনো পরিস্থিতিতেই প্রজাপরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন না, তাদের সঙ্গে কিছুই করবেন না। প্রজা পরিষদ রাজনৈতিক দল হিসাবে থাকবে কিনা সেটা আপনার উপর নির্ভর করবে না। নির্ভর করবে তারা কতটা সাড়া পাচ্ছে।

যদি আপনি অর্থাৎ যিনি রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং যার হাতে সরকারী শাসনতন্ত্র ন্যস্ত, তিনি যে দল বিরুদ্ধাচরণ করছে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলে দেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রমাণ রেখেছে, আন্দোলন গোপন পথ ধরে এবং শেষ পর্যন্ত পরাক্রমশালী এক নায়কও হার মানেন। আমি আবার বলি আপনার মতো একজন মানুষ যিনি প্রচুর ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে বর্তমান খ্যাতিতে পৌঁছেছেন ইনি কখনও এই ধরনের বিপজ্জনক ও আত্মবিনাশকারী পদ্ধতি অবলম্বনের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ঃ- আপনার প্রজাপরিষদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে না চাওয়ার কারণ আমার বিশ্বাস, প্রজাপরিষদের অতীত কর্ম ও তাদের কর্মসূচীর সম্বন্ধে আপনার মূল্যায়ন। আপনি বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কথা বলছেন। আমি ওই সংগঠনের লোক নই কিন্তু ওই সংগঠনের সঙ্গে বহু লোককে চিনি এবং তাদের আদর্শবাদ, দেশপ্রেম, ত্যাগের মানসিকতা এবং সেবার জন্য তাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আছে। তারা অতীতে কিছু ভুল করে থাকতে পারে যেমন আমিও করেছি। কিন্তু আমরা এই সংস্থাকে কখনই জাতির শত্রু হিসাবে গণ্য করতে পারি না। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া গোটা ভারতে সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়েছে। কয়েক বছর আগে সংঘের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ ছিল। আদালতে বা অন্য কোথাও তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ ছিল। আইন আদালতে বা অন্য কোথাও তাদের বিরুদ্ধে এ-সবের কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তাদের কোন কর্মীই হাঙ্গামা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়ে অভিযুক্ত বা দণ্ডিত হয়নি। কোনও নিরপেক্ষ বিচারালয়ই আপত্তি জানায়নি তাদের উদ্দেশ্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে। গাঁধীজির দুঃখজনক হত্যার সঙ্গে সংঘের জড়িত থাকার অভিযোগ বিন্দুমাত্র প্রমাণিত হয়নি। সংঘ যদি কিছু আদর্শবাদ প্রচার করে থাকে যা আপনি অথবা আপনারা পছন্দ করেন না, আপনি তার বিরুদ্ধে প্রচার করতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ও প্রজা পরিষদের বিরুদ্ধে একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছেন যে, ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের ক্রান্তিকারী দিনগুলিতে তারা জম্মুর কিছু অঞ্চল থেকে মুসলিমদের তাড়িয়েছিল। এমনকি কোন কোনও ক্ষেত্রে তাদের জীবন সম্পত্তি হানি করার মতো নীচ কাজে তারা অংশগ্রহণ করেছিল।

এই অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাড় করা আমার সাধ্যাতীত। যারা এই কাজ করেছিল এবং তাদের যদি খুঁজে পাওয়া যায় তবে আপনি ক্ষমতায় আসার পরে তাদের কেন বিচারের এজলাসে তোলা হচ্ছে না।

মুসলমানদের প্রতি আক্রমণের আগে জম্মুতে হিন্দু ও শিখদের ভাগ্যে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন নি কেন? প্রায় ১৫- ২০ হাজার হিন্দু, পাকিস্তানী আক্রমণকারী ও স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা কচুকাটা হয়েছিল ওই এলাকায়। আজও প্রায় ৫ হাজার অপহৃত হিন্দু নারী উদ্ধার করা যায়নি। ঐ সমস্ত খুন স্পষ্টতই হিন্দু বা শিখরা করেনি। করেছে মুসলমানরাই। গাঁধীবাদী মানসিকতা নিয়ে আপনি কেন সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেন নি?

প্রার্থনা করি আমাকে মুহূর্তের জন্য ভুল বুঝবেন না। এই সব ঘটনাবলীকে আমি সমর্থন করছি না। একটা খারাপ কাজ অন্য একটা খারাপ কাজকে সমর্থন করে না। আমার মূল বক্তব্য হলো আমরা যদি ভারতের মঙ্গল চাই তাহলে অতীতের ওই সব দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি ভুলে যেতে হবে।

নোয়াখালি ও কলকাতার রায়ট ঃ- বাকী দেশে কী ঘটেছিল। আমার নিজের প্রদেশ বাঙ্গালায় কী ঘটেছিল। ১৯৪৬ আগস্টে মুসলীম লীগ মন্ত্রীসভার ও বৃটিশ গভর্নরের নাকের ডগায় হাজার হাজার হিন্দুকে কলকাতার বুকে কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে পরে তারা প্রত্যাঘাত করে। দু'মাস পরে নোয়াখালি জেলায় কী ৩০ হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরীত করা হয়নি? হিন্দুরা পরে প্রত্যাঘাত করে। শয়ে শয়ে নারীকে ধর্ষণ করা হয়নি। আপনি কি মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা ১৯৪৬ কিংবা ১৯৪৭ সালে যা করেছিল আমি তাদের উপর বরাবরের জন্য ঘৃণা ও প্রতিশোধের স্পৃহা বহন করে চলবো।

একই ধরনের ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের ক্ষেত্রে ১৯৪৬ বা ১৯৪৭ সালে যারা দাঙ্গা করেছিল আজকে তাদের অনেকেই সাদা টুপী পরে কংগ্রেসী বলে গৃহীত হয়েছে এবং দাঙ্গা সংগঠন করেছেন ও নরহত্যাসহ গভীর অভিযোগ আছে এমন কিছু নেতা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে বসে আছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর সমেত গোটা ভারতের মানুষদের এমন এই অধ্যায়কে সমাপ্ত বলে ঘোষণা করতে হবে এবং অপরের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে বন্ধুত্বের হাত, যাতে উভয়েই এমন একটা দেশ গঠন করতে পারি, যেখানে ধর্ম কোন বিবদমান গোষ্ঠীতে পরিণত করবে না। বরং পরস্পরের প্রতি সম্মান ও বোঝাপড়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারবে, যাতে উভয়ে একই মাতৃভূমির সাধারণ নাগরিক হিসাবে আত্মোন্নতির প্রয়োজনে একই অধিকার ও সুযোগ সুবিধার সঙ্গে কাজ করতে পারি। এই চিঠির সঙ্গে আমি রাজ্যের প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কৃত অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের তথ্য সম্বলিত একটি বিবৃতিও পাঠাচ্ছি। এগুলির সত্যতা

জানার কোনও উপায় আমার নেই। পক্ষান্তরে আপনার তরফ থেকে অস্বীকার কিংবা আপনার কোনও কর্মচারীকৃত প্রতিবেদন এইসব অভিযোগের উত্তর হতে পারে না। এর অর্ধেকও যদি সত্য হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে কী গভীর ব্যাপার চলছে ওখানে? একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনই কোন সত্য নিষ্কাশিত করতে পারে না।

আমি আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করবো এই অবস্থাতেও থামুন। শুধুমাত্র দমন নীতি এই সমস্যাটির সমাধান করবে না। তা কেবল ঘৃণা ও তিক্ততার সৃষ্টি করবে যা সহজে বিদূরিত হবে না। জেলে থাকা আপনার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করলে আজ আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হবে না। আন্দোলনের অবসান ঘটাতে হলে আমাদের শুরু করতে হবে নতুন করে। জম্মুর বহু মানুষের ভয় ও সন্দেহের কথা জেনে আমি নিশ্চিত যে আপনি যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করেন এবং খোলা মন নিয়ে তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাহলে শান্তিতে ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার সৃষ্টি হবে এবং সকলে মিলে উন্নতির পথে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হবে।

আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না বরং আপনার রাজনীতি কুশলতা ও বাস্তব বোধ সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করবে।

আপনাকে আমি চিঠি লেখা কর্তব্য মনে করেছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম আপনি যেহেতু সারাজীবন ধরে একজন যোদ্ধার, যেহেতু যারা আপনার সঙ্গে ভীষণভাবে ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের সঙ্গে আপনি সেই খেলা খেলতে ইতস্তত করবেন না। এখনও পর্যন্ত আমি আপনার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারলাম না। এখন আপনি ক্ষমতায় আসীন, আপনার সঠিক পদক্ষেপের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। আমি এই পত্রালাপ বন্ধ করছি এই দুঃখ নিয়ে যে আমাদের সামনে সমূহ বিপদ থাকা সত্ত্বেও আমরা কোন মতৈক্যে পৌঁছতে পারলাম না।

আপনার বিশ্বস্ত
শ্যামাপ্রসাদ

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ ওই চিঠির উত্তর দিলেন শেখ আব্দুল্লা।

যেহেতু আপনি আর পত্রালাপ চান না। আপনি চিঠিতে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন সেগুলির বিস্তারিত উত্তর আমি দিতে চাই না। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে ধন্যবাদ দিলেন তার চিন্তাধারা বুঝতে দেওয়ার জন্য। শেষে লিখলেন আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকুক এবং আমাদের বিচার করার জন্য থাকুক অনাগত ভবিষ্যতের জন্য।

হানাদারদের যুদ্ধের পর শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর মুক্তির প্রত্যক্ষ সংগ্রামও তথায় অন্তিম শয্যা ঃ-

জওহরলাল ও শেখ আব্দুল্লা প্রজাপরিষদের আন্দোলনের চরিত্র হননের প্রচেষ্টা চালালেও জম্মুর ভারতভুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে সারা ভারত জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস চালালো অমৃতসরে। পথে পথে মিছিল বের করা হলো, আম্বালা, লুধিয়ানা, লখ্‌ণী, কলকাতা ইত্যাদি নানা শহরে। প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গ পরিক্রমা শুরু করলেন। বাংলায় প্রতিবাদে ঝড় ওঠার কারণ মিঃ জিন্নার দাঙ্গায় শত শত হিন্দু অধিবাসীর মৃত্যু এখনও জ্বল জ্বল করছে। তারপরও ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগের দগদগে ঘা বাঙ্গালীর মনে গেঁথে আছে। ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে নোয়াখালির দাঙ্গায় বহু সহস্র হিন্দুর ধর্ম্মান্তরকরণ এবং তৎপরবর্তী গাঁধীজির "নাটকীয়" নোয়াখালি ভ্রমণ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। দিল্লীতে হরতাল হলো। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুলতবী প্রস্তব তোলার চেষ্টা করলেন বিরোধী সদস্যরা। কিন্তু তা সম্ভব হলো না যেহেতু তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যিনি আবার "নেহেরু ভক্ত" এবং নেহেরুজীকে নাম ধরে সম্বোধন করতেন।

লোক সভায় বিরোধী সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দিলেন। যথারীতি নেহেরু ভক্ত তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রী গণেশ বিষ্ণু মবলঙ্কর উত্থাপনের অনুমতি দিলেন না। লোকসভায় হাঙ্গামা হলো। লোকসভায় শ্রী ডি.জি দেশপান্ডেকে মার্সাল দিয়ে বের করে দিতে হলো। প্রতিবাদে বিরোধীরা সভা কক্ষ ত্যাগ করলো। এইভাবে প্রজাপরিষদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানালো গোটা ভারত।

এদিকে শেখ আবদুল্লা জওহরলালকে মান্য করতে রাজী নন। রাজী নন, জম্মুর জন্য তদন্ত কমিশন গঠন করতে। দিল্লী চুক্তি সম্পূর্ণ করতে গড়িমসি করতে লাগলেন। চুক্তির বিভিন্ন ধারা লাগু করার জন্য, বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠন করলেন, যাতে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা যায়। অন্যদিকে প্রজাপরিষদের আন্দোলনের বিপক্ষে তিনি উপত্যকার মুসলমানদের খেপাতে লাগলেন। এ ব্যাপারে উপত্যকার পাকিস্তান পন্থী মুসলিমরা মহিউদ্দিন কারার নেতৃত্বে আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। ১৯৫৩ সালের ৩ মার্চ নেহেরুজী তার ভগীনি শ্রীমতী বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিতকে লিখলেন- যে শেখ আবদুল্লা কোথায় কি ব্যবস্থা নিতে হবে, তা সম্যক অনুধাবন করতে পারবেন না, আবার অন্য লোকের "সৎ" পরামর্শও নেবেন না। ওদিকে আপোষ মীমাংসায় শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ বুঝলেন এবার আন্দোলন ও সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে হবে তাঁকেই। এখানে বলে রাখা ভালো যে নেহেরুজীর মন্ত্রীসভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। যতদূর জানা যায় এই ব্যাপার নিরসন করার জন্য তৎকালীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কোনও কার্যকরী ভূমিকা নেন নি। কারণ রাজেন্দ্র প্রসাদ 'পরম' নেহেরু ভক্ত ছিলেন, রাষ্ট্রপতি পদের

দৌড়ে ডাঃ চক্রবর্তী রাজা গোপালচারীকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। মনে রাখা ভালো যে এই সংগ্রাম শুধু কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সংগ্রাম নয়- এ সংগ্রাম সারা ভারতের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির রক্ষার সংগ্রাম। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে জনসংঘ জম্মু আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য সভা ও শোভাযাত্রা করার কর্মসূচী গ্রহণ করলো। এ বিষয়ে নেহেরুজীর একটা অদ্ভুত দ্বিচারিতা ছিল। তিনি কাশ্মীরের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে দিতে রাজী কিন্তু জম্মু অধিবাসীরা ওটা চাইলে—তা সাম্প্রদায়িক হয়ে যায়। নেহেরু ভক্ত ও বংশবদ ঐতিহাসিক শ্রীসর্বপল্লী গোপাল তাঁর মত লিখেছেন "শেখ আবদুল্লা ও শ্যামাপ্রসাদ দুজনেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কাশ্মীরকে ভাগ করতে চান দেখে জওহরলাল জটিল সমস্যার মধ্যে পড়ে এই পরিস্থিতিতে শেখ আবদুল্লাকে তার মনোবল ফিরে পাওয়ার জন্য নেহেরুজী কড়া হাতে দমন করতে চাইলেন, কারণ নেহেরুর ধারণা ছিল ব্যাপারটা রাজদ্রোহ (Sedition)। নেহেরুর ধারণা ওটা কেবল হিন্দুদের বেলায়ই ঘটবে।

সুতরাং সেকুলার জওহরলাল আস্তিনের ভেতর থেকে তার নখ বের করলেন। নিবর্তনমূলক আটক আইনে (Preventive Detention Act-1935) অনেকেই আটক হলেন।

গ্রেপ্তার হলেন পাঞ্জাবের জনসঙ্ঘের নেতারা, দিল্লী ও গোটা পাঞ্জাব রাজ্যে ১৪৪ ধারা জারী হলো।

এইভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী শেখ আবদুল্লার মনোবল ফেরাতে ভারতের জাতীয় সরকার এবং জনগণের সরকার (মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করছে দেখে যথেষ্ট ক্ষুদ্ধ হলেন শ্যামাপ্রসাদ। সরকারের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের করার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। জাতিকে এই সংগ্রাম অংশীদারী করার জন্য) তিনি ৫.৩.৫৩ সারা ভারত কাশ্মীর দিবস পালনে আহ্বান করলেন। মিছিলে মিটিংয়ে সারা উত্তর ভারত জুড়ে লোকে ছয়লাপ।

জনমতের গতিপ্রকৃতি দেখে সরকার বুঝলো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাশ্মীর দিবসে সভা ও শোভাযাত্রা হবেই। তাই সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য দিল্লী থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হলো। দিল্লীর কুইন্স গার্ডেন্সে এক বিরাট সভা হলো ওই দিবসে। ওই সভার সভাপতিত্ব করেন স্বামী করপাত্রজী। শ্যামাপ্রসাদ ছাড়াও ওই সভায় ভাষণ দেন হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি শ্রী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পন্ডিত মৌলিচন্দ্র শর্ম্মা। শ্যামাপ্রসাদ ভাষণে বললেন যে প্রজা পরিষদের আদর্শ সমগ্র ভারতের আদর্শ। তিনি জওহলালকে প্রজাপরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তার পূর্ণ বিবরণ দিলেন। তারপরে বললেন-এর পর ভারতের জনগণকে ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের অভিমত ঘোষণা করবার অধিকার দিতে হবে কারণ তিনি বললেন- Freedom of speech প্রত্যেক নাগরিকের সংবিধান গত প্রাপ্য অধিকার। এটা তার মৌলিক অধিকার-কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

কাশ্মীর দিবস শান্তিপূর্ণভাবে কাটলো। কিন্তু গোলমাল বাধলো পরের দিন সেদিন জম্মুতে

পুলিশের গুলিতে নিহত কয়েকজনের চিতাভস্ম দিয়ে মিছিল করার কথা ছিল কিন্তু শোভাযাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগেই আবার চালু হলো ১৪৪ ধারা। ঐ শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য নেতারা চাঁদনীচকে উপস্থিত হওয়া মাত্রই ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার করা হলো তাদের। দেশ বরেণ্য নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদে সারা দেশে হরতাল পালন করা হলো। দিল্লীতে আইন অমান্য করে রাজপথে শোভাযাত্রা বের করলো বহু মানুষ। সঙ্গে চললো পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস। সারা ভারতে জম্মু ধাঁচে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিস্তৃত হওয়ার প্রচলন সম্ভাবনা দেখা দিল।

ওদিকে শ্যামাপ্রসাদকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে না তোলায় লোকসভার সদস্য বাবু রাম নারায়ণ সিং সুপ্রীম কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন জানালেন। আদালতে দিল্লীর সরকারী কতৃপক্ষের ত্রুটিগুলোর সমালোচনা করলেন বন্দীদের কৌসুলী জয়গোপাল শেঠী। বিভিন্ন ত্রুটির সমালোচনা করলেন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ ব্যানার্জী, বিচারপতি বিজন বিহারী মুখোপাধ্যায (ইনি ইতিপূর্বে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন) ও বিচারপতি হাসান। সর্বশেষে প্রধান বিচারপতি পতঞ্জলী শাস্ত্রী যখন শ্যামাপ্রসাদকে মুক্তির রায় দিলেন তখন সুপ্রীম কোর্টের গ্যালারী দর্শকে পরিপূর্ণ বহু লোকসভার সদস্যও এসেছিলেন বিচার দেখতে। আদালতের বাইরে "পুলিশী বন্দোবস্ত" দেখবার মতো ছিলো।

বিচারপতিরা তাদের (ওঠা ডিভিশন বেঞ্চ ছিল) সর্বসম্মতি রায়ে বললেন যেহেতু গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্দীদের কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়নি সেহেতু সংবিধানের ২২ ধারা অনুযায়ী তারা মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। আটক পত্রও (Invoice & Case Records) ঠিকভাবে তৈরী হয়নি। সেজন্য আদালত দিল্লীর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন।

শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সহকর্মীরা ১১ মার্চ মুক্তি লাভ করলেন। অবশ্য ১৪৪ ধারার অভিযোগ বহাল রইল তাঁর বিরুদ্ধে এবং সেজন্য ১০০ টাকার P.R. বন্ডে মুক্ত রইলেন তিনি। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আদালত কক্ষ থেকে সোজা লোকসভার অধিবেশনে চলে এলেন। লোকসভার সদস্যরা তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধনা জানালেন তাঁকে। তখন লোকসভায় পেপসু PEPSU- (রাজ্য পুনর্গঠনের আগে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নিয়ে গঠিত ছিল) তাই নিয়ে সেখানে আলোচনা চলেছিল। রাষ্ট্রপতির শাসন অনুমোদনের জন্য বিতর্ক চলছিল। শ্যামাপ্রসাদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। আন্দোলন দমন করার জন্য নেহেরুজীর ক্ষিপ্রতা, শ্যামাপ্রসাদের মুক্তিতে জওহরলালের কপালে ভাঁজ পড়ল। স্বাধীনতার পর এমন জটিল সমস্যায় তিনি আর কখনও পড়েননি। তিনি পাঞ্জাব ও দিল্লীর প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করতে, তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থকে নির্দেশ দিলেন যাতে উত্তরপ্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকরা দিল্লী এবং পাঞ্জাবে আন্দোলনে

যোগ দিতে না পারে, তার ব্যবস্থা নিতে। তখনকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বললেন জনসঙ্ঘকে কিভাবে নিষিদ্ধ করা যায় তার পথ বাতলাতে।

প্রজাপরিষদের আন্দোলনের পরিধি বাড়লো ঃ- প্রজাপরিষদের আন্দোলন সারা ভারতে সমর্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর সরকার জম্মুতে দমননীতি বাড়িয়ে দিল। ডোগরা পুলিশ প্রতিস্থাপিত হলে কাশ্মীরি পুলিশ দ্বারা। সঙ্গে যোগ দিল কাশ্মীরি জাতীয় বাহিনী (এটা শেখ আব্দুল্লার তৈরী বাহিনী) জম্মুতে বারবার সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো ডোগরারা। এ সমস্ত ঘটনায় ধৈর্য হারিয়ে ফেললো জম্মুবাসীরা। তারা বলের বিরুদ্ধে বল (Eye for eye) প্রয়োগের আবেদন জানালো প্রজাপরিষদের তৎকালীন নেতা দুর্গাদাস বর্ম্মাকে, তাদের মধ্যে একজন লিখলো, আমরা সৈনিক, পৃথিবীর বহু অংশে যুদ্ধ করেছি (বৃটিশ আমল থেকে ডোগরা রেজিমেন্টের সাহসিকতা সুবিদিত। অনেকটা গোর্খা বাহিনীর মতো সেটা বৃটিশরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে) কিন্তু যখন আমাদের সামনে নারীর মর্যাদাহানি করা হচ্ছে তখন আমরা কোনদিনই অহিংস থাকতে পারি না।

জম্মুর জন আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ঃ- জম্মুর মানুষদের মনোভাবে অস্বস্তি বোধ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি তাঁর সহকর্মী লোকসভার সদস্য উমাশঙ্কর দীক্ষিত ও ডিজি দেশপাণ্ডেকে পাঠালেন জম্মুতে, সেখানকার জনগণকে শান্ত করার জন্য। কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের জম্মু প্রবেশের অনুমতি দিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে যাবার উদ্যোগ নিলে তাদের নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার করা হলো। ফলে শ্যামাপ্রসাদ নিজে সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাঁকেও অনুমতিপত্র দেবে না। এই অনুমতিপত্র 'ব্যবস্থার' উদ্দেশ্য ছিলো পাকিস্তানে গুপ্তচরদের কাশ্মীর প্রবেশ করতে না দেওয়া। লোকসভার সদস্য প্রভৃতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই অনুমতিপত্র ব্যবস্থার প্রয়োগ যে নীতি বিরুদ্ধ কাজ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্যামাপ্রসাদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে এই অনুমতিপত্র ব্যবস্থার আইনগত ব্যাখ্যা চাইলেন কিন্তু যথারীতি তাঁর চিঠির কোনও উত্তর এল না। সুতরাং তিনি বিনা অনুমতিতে জম্মু যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাওয়ার আগে তিনি সংবাদ মাধ্যমের কাছে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দিলেন।

নেহেরুজীর দ্বিচারিতা ঃ- শেষ বিবৃতির এক অংশে তিনি বললেন যে পণ্ডিত নেহেরু বারবার ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও কেউ অনুমতি ছাড়া ওই রাজ্যে প্রবেশ করেত পারে না। এটা বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁর জম্মু যাওয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন, সেখানকার ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা ও সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হওয়া এবং প্রজাপরিষদ ছাড়াও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করবেন।

আন্দোলন প্রত্যাহারের শেষ এবং মরিয়া চেষ্টা ঃ- তাঁর জম্মু যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা কী তা জেনে শান্তিপূর্ণভাবে ও সম্মানের সঙ্গে এই আন্দোলন প্রত্যাহার

করার কোনও পথ আছে কিনা তা খুঁজে বের করাই তাঁর জম্মু যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৯৫৩ সালের ৮ মে সকাল ৮টার সময় তিনি নয়াদিল্লী থেকে জম্মুর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। যাত্রা শুরু হবার ঠিক আগে সমবেত সাংবাদিকদের তিনি জানালেন তার জম্মু অভিযানের উদ্দেশ্য। জম্মুতে হাজার হাজার মানুষ কারারুদ্ধ, চল্লিশজন যুবক প্রাণ হারিয়েছে পুলিশের গুলিতে। সেখানে গিয়ে অবস্থাটা সচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যেই তাঁর যাওয়া। তাছাড়া প্রজাপরিষদ ও শেখ আব্দুল্লার মধ্যে কোনও মীমাংসা করা যায় কিনা তার চেষ্টাও তিনি করবেন। অবস্থা যদি অনুকূল হয় তাহলে দিল্লী ও পাঞ্জাবে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চলছে তার মীমাংসা করাও সম্ভব হবে। সব শুনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন উদ্দেশ্য তো মহৎ বোঝা গেল, কিন্তু আপনি বেআইনী পথ নিচ্ছেন কেন? প্রশ্ন শুনে বিস্ময় বোধ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ঐ সাংবাদিকদের অর্বাচীন প্রশ্নে কৌতুকবোধ করলেন এবং কিছুটা উত্তেজিত বোধ করলেনও। তিনি সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন তাঁর যাত্রার মধ্যে কোন অস্বচ্ছতা নেই তো? কারণ তাঁর মতে ঐ পারমিট ব্যবস্থার কোনও রকম আইনী স্বীকৃতি নেই। তিনি দায়ী করলেন যে কাশ্মীর যদি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশই হয় তবে তিনি ভারতের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে বে-আইনী পারমিট সিস্টেমের মারফত জম্মুতে ঢুকতে হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাঙলার লোক পাঞ্জাবে গেলে কি পারমিট লাগে? বিহারের লোক বাঙলায় গেলে পারমিট লাগে, উত্তরে এক সাংবাদিক বললেন সেটা তো তর্কের ব্যাপার। কিন্তু আইন যেটা আছে, সেটা না মানা কি বে-আইনী নয়? তিনি উত্তর দিলেন তা হয়তো হয়। কিন্তু আইনটা যেখানে "জবরদস্তি" তাকে না মানাই আইনের পথ। নিজের বক্তব্য আরও পরিষ্কার করে বললেন, "শ্রীনেহেরু বার বার বলেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে বিন্দুমাত্র গলদ নেই। ওটা সম্পূর্ণভাবে ভারতের অঙ্গ হয়ে গেছে কিন্তু তার বক্তব্যের জ্বলন্ত 'খেলাফ' এই পারমিট প্রথা এটাই দেশের লোকের কাছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আমার জম্মু যাওয়া। আমি আমার 'অধিকার' প্রয়োগ করতে চলেছি। ভারতের লোকসভার সদস্য হিসাবে দেশের যেকোন প্রান্তে যাওয়ার অধিকার আমার আছে। জম্মুতে প্রবেশের আগে পাঞ্জাবের কয়েকটি জায়গায় পরিভ্রমণ করলেন শ্যামাপ্রসাদ। অমৃতসরে, জলন্ধরে, আম্বালায় নানাস্থানে চললো তাঁর পরিক্রমা। জনগণের কাছে জম্মু ও কাশ্মীর পরিস্থিতির অবস্থা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললেন। তাহার সহযাত্রী দিল্লী জনসঙ্ঘের সভাপতি গুরুদত্ত বৈদ্য, পাঞ্জাবের নেতা টেঁকচাঁদ শর্মা, অধ্যাপক বলরাজ মাধোক এব সঙ্ঘের তরুণ কর্মী অটল বিহারী বাজপেয়ী (পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বাজপেয়ী জীই একমাত্র প্রথম ব্যক্তি যিনি পর পর দু'বার প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু তার পর একমাত্র মনমোহন সিংজীও একাদিক্রমে দু'বার প্রধানমন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করেছেন। (শ্রী বাজপেয়ীজী এখন প্রয়াত)। পাঞ্জাব পরিক্রমা কালে আম্বালা থেকে শ্যামাপ্রসাদ

শেখ আব্দুল্লাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন। উক্ত টেলিগ্রামে তিনি জানালেন জম্মুর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার মীমাংসা করার চেষ্টায় তিনি জম্মু যাচ্ছেন এবং সম্ভব হলে শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। শ্যামাপ্রসাদের টেলিগ্রামের কপি জওহরলালের কাছেও পাঠালেন। অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করেন নি এবং সবকিছু আইন মোতাবেক করেছেন।

টেলিগ্রামের উত্তর ৯ তারিখে পাঞ্জাবের ফাগুয়ারায়। শেখ আব্দুল্লা লিখেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদের জম্মু আসা উচিৎ হবে না এতে সমস্যার কোনও সমাধান হবে না।

পাঞ্জাব সফর শেষ করে ১০ মে সন্ধ্যায় জলন্ধর স্টেশনে তিনি ট্রেনে উঠে শ্যামাপ্রসাদ দেখলেন সেই কামরায় এক ভদ্রলোক বসে। তিনি নিজেকে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বলে দাবী করলেন, কথায় কথায় তিনি শ্যামাপ্রসাদকে জানালেন যে তাকে পাঠানকোটে যেতে দেওয়া হবে না। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে এবং এটা পাঞ্জাব সরকারের আদেশ। তবে শ্যামাপ্রসাদকে কোথায় কখন গ্রেপ্তার করা হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশ আসেনি।

১১ মার্চ যখন শ্যামাপ্রসাদ গুরুদাসপুর জেলায় ঢুকলেন তখন বাটালায় স্থানীয় এস.পি. এসে ট্রেনের কামরায় বসলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি জানালেন শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করতে তিনি আসেননি। তিনি কেবলমাত্র তার এলাকা পার করে দেবেন। গুরুদাসপুরে তিনি নেমে গেলেন গুরুদাসপুরের এস. ডি.ও তার স্থলাভিষিক্ত হলেন তার জায়গায়। এই ভদ্রলোক শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গী হলেন পাঠানকোট পর্যন্ত। পাঠানকোট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জেলা মেজিস্ট্রেট ও অন্যান্য অনেক কর্মচারীর দেখা পাওয়া গেল। তবে তাঁরা কেউ শ্যামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করলেন না। তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না।

শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গী সাথী নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বেলা বারোটা নাগাদ গুরুদাসপুরের জেলা মেজিস্ট্রেট লোক পাঠিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। তিনি তার অনুমতি দিলেন। তিনি একটা নাগাদ শ্যামাপ্রসাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জানালেন, সরকারের কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, শ্যামাপ্রসাদের ও তাঁর সহযাত্রীদের যেন জম্মু রওনা হতে দেওয়া হয়। এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কারও কোন অনুমতিপত্র না থাকা সত্ত্বেও।

চরম বিশ্বাসঘাতকতা ঃ- জেলা মেজিস্ট্রেট জম্মু যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করারও প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রশাসনের একজন কর্মচারী তার দলবল নিয়ে জিপে করে মাধোপুর চেক পোস্ট পর্যন্ত গেলেন শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে। মাধোপুর চেকপোস্টে পৌঁছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তার অধীনস্থ অফিসাররা সকলেই দাঁড়িয়ে থেকে শুভযাত্রা জানিয়ে বিদায় নিলেন। শ্যামাপ্রসাদের জিপ জম্মুর পথে রাভী নদীর সেতু পার হতে লাগল।

কিন্তু সেতুর উপর দিয়ে অর্ধেকটা যেতেই দেখা গেল পথ আটকে এক কনস্টেবল। তাদের নেতৃত্বে কাঠুয়ার পুলিশ সুপার মি. আজীজ। মি. আজীজ জম্মু ও কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারীর স্বাক্ষর করা একটি আদেশপত্র দেখিয়ে বললেন কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারী আপনাকে এই রাজ্যে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। আদেশপত্রে লেখা আপনি ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী এমন কাজ করতে যাচ্ছেন যা জনগণের নিরপত্তা ও শান্তির পক্ষে বিঘ্নজনক, আপনাকে এই কাজে বাধা দেওয়া প্রয়োজনীয়। সেজন্য জম্মু ও কাশ্মীর জননিরাপত্তা আইন অনুযায়ী আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কাশ্মীরে প্রবেশ, বসবাস, ও থাকতে পারবেন না। শ্যামাপ্রসাদ শুধালেন ভারত সরকার আমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছে, আপনারা আটকাবার কে? আমি সেখানে যাবোই।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সুপার অ্যারেস্টের আদেশ পকেট থেকে বের করলেন। সেটা জম্মু ও কাশ্মীরের আই. জি পৃথীনন্দন সিং-এর স্বাক্ষর করা তাতে লেখা, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, ৩০ তুঘলক ক্রিসেন্ট, নয়াদিল্লী। তাতে লেখা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করার কাজ করছেন এবং করতে চলেছেন। সেজন্য জম্মু ও কাশ্মীরের জননিরাপত্তা আইন অনুসারে আমি আদেশ দিচ্ছি উক্ত শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হউক। সেজন্য ক্যাপ্টেন আব্দুল আজিজ, পুলিশ সুপার কাঠুয়া, আপনাকে ক্ষমতা ও নির্দেশ দিচ্ছি উক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করতে এবং শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করতে। আপনি একাজে ঢিলা দেবেন না।

দেখা যাচ্ছে প্রথম আদেশে যে কাজ করতে যাচ্ছেন বলে বলা হলো, এক মিনিটের মধ্যে বলা হলো তিনি সেই কাজ করেছেন।

শ্যামাপ্রসাদ জিপ থেকে নেমে পুলিশ বেস্টনী পার হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। গুরুদত্ত বৈদ্য ও টেকচাঁদ শর্মা শ্যামাপ্রসাদের সহগামী হওয়ার আকঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় তাদেরও বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা হলো। এইভাবে কৌশলে শ্যামাপ্রসাদকে এমন কথা বলে গ্রেপ্তার করা হলো সেখানে ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের হাত পৌঁছয় না। ইতিহাসবিদ সর্বপল্লী লিখেছেন "গোটা ব্যাপারটা প্রশাসনের অকর্মণ্যতা, কারণ এর পরেই জওহরলাল প্রতিবাদ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকৈলাস নাথ কাটজু (যিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন) ও তৎকালীন পাঞ্জাবের মুখমন্ত্রী লালা ভীমসেন সাচারকে চিঠি লিখেছেন এই ঘটনায় সর্বপল্লী গোপাল, নেহেরুজীকে আড়াল করেছেন। নেহেরুজী ওদের দু'জনকেই পদ থেকে সরাতে পারতেন কিন্তু নেহেরুজী তার কোনটাই করেন নি, কিংবা করার সাহস দেখান নি।

বশংবদ গোপাল যিনি নেহেরুজীর জীবনীকার তিনি ব্যাখ্যা করেননি, কীভাবে কাঠুয়ার পুলিশ সুপারের পকেট থেকে একই সঙ্গে দু'দুটি আদেশ বের করলেন, বোধ হয় নেহেরুজী হিন্দি সিনেমার কায়দায় এই অধ্যায়টির চিত্র নাট্যের কথা ভাবছিলেন। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে নেহেরুজী হিন্দি সিনেমার ভক্ত ছিলেন এবং তার বিচারে দিলীপকুমার

অভিনীত ছবিগুলি খুব প্রিয়)। প্রশ্ন উঠেছে কাশ্মীর প্রশাসন কেন বন্দীকে ভারতেই ফেরত পাঠালেন না, তা ছাড়া গুরুতর অপরাধের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাছে ডেকে কিংবা ফোনে ধমকাতে পারতেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তা করেননি।

রাভী নদীর অপর পারে বন্দীদের আটকে রাখা হলো লাখনপুরের চেকপোস্টে। তারপর একজন ভদ্রলোক নিজেকে জম্মু ও কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ বলে পরিচয় দিয়ে একটু পরোয়ানা পাঠ করে গুরুদত্ত ও টেকচাঁদকে গ্রেপ্তার করলেন। শেষে তিন বন্দীকে একটি জিপে উঠিয়ে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটানের অধীনে কুমায়ুন রেজিমেন্টের কয়েকজন সৈনিকের পাহারায় পুলিশ শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সেই জিপ রাত সাড়ে দশটায় উধমপুরে পৌঁছলো। সেখানে এক ডাকবাংলোতে তাদের নৈশ ভোজের ব্যবস্থা ছিলো। শ্যামাপ্রসাদের সকাল সকাল শুয়ে পড়া অভ্যাস ছিলো। তাছাড়া পথশ্রমে তিনি ক্লান্তও বোধ করেছিলেন, সেজন্য তিনি সেখানেই রাত্রিবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কিন্তু সেনাদলের ক্যাপ্টেন জানালেন ডাক বাংলোয় কোনও ঘর খালি নেই। সেজন্য বন্দীদের রাত্রিবাস ব্যবস্থা বাটোট বাংলোয় করা হয়েছে। সুতরাং নৈশ আহারের পর আবার চললো জিপ। রাত দুটোয় বাটোট ডাক বাংলোয় পৌঁছল জিপ, পরদিন সকালে চা-পানের পর আবার শুরু হলো যাত্রা। দুপুর একটায় কাজী কুণ্ডুতে পৌঁছলে সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজ সারা হলো। সেখান থেকে রওয়ানা হল দুটো নাগাদ। প্রায় বিকাল তিনটে নাগাদ শ্রীনগরে পৌঁছলো বন্দীরা। সেখানে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর নিশাত বাগের কাছে হেদার ভিলা নামক একটি ছোট ডাক বাংলোতে নিয়ে যাওয়া হল বন্দীদের। (এখানে বলে রাখা ভালো যে মোঘল সম্রাটদের কাছে কাশ্মীর ও সংলগ্ন জায়গা সম্রাটদের কাছে খুব প্রিয় ছিল এবং তারা ছয়টি বাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম নিশাত বাগ) সেখানে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করলেন জেল সুপার শ্রীকান্ত, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং শ্রীনগর স্টেট জেনারেল হসপিটালের চিকিৎসক ডঃ আলী মহম্মদ। তারা সকলে শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন। শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তারের পর শেখ আব্দুল্লা তার বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন। বিনা অনুমতিতে কাশ্মীর প্রবেশ করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ওই সময়ে কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য কাশ্মীর সরকারের কোনও অনুমতিপত্র ব্যবহার করার প্রচলন ছিল না। ক'দিন পরে অবশ্য কাশ্মীর সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে কাশ্মীরে প্রবেশের জন্য অনুমতিপত্র ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এইটা সুবিদিত ফৌজদারী নিয়ম অনুযায়ী কোনও আইনি ধারা পূর্বানুপর (Retrospective) চালু করা যায় না কারণ ফৌজদারী আইন সব সময় আসুপ্রবর্তনকারী (Prospective) হয়।

অসুস্থতার প্রথম সূত্রপাত ঃ- হেদার ভিলাতে বন্দী হওয়ার তিন দিন পর শ্যামাপ্রসাদের ডান পায়ে হঠাৎ যন্ত্রণা শুরু হলো। সঙ্গে তাহার জ্বরও হলো। ডাক্তার আলী মহম্মদ এলেন

অসুস্থার সংবাদ পেয়ে। তিনি পায়ে বেলাডোনা প্লাস্টার লাগাবার ও মুখে খাওয়ার ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। ডাঃ আলি মহম্মদ জানালেন শ্যামাপ্রসাদকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো এবং তিনি এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত কথা বললেন। হাসপাতাল থেকে প্রেমনাথ বলে একজন ডাক্তার আসতেন। তিনি রোজ বেলেডোনা প্লাস্টার লাগাতেন শ্যামাপ্রসাদের পায়ে। চার-পাঁচ দিন পরে সুস্থ্য হয়ে উঠলেন শ্যামাপ্রসাদ। (বলে রাখা ভালো যে এই অসুস্থতার পর শ্যামাপ্রসাদের জন্য কোন মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়নি কিংবা মেডিকেল বুলেটিন প্রকাশ করা হয়নি। এইখানে বলে রাখা ভালো যে ২৬/১১ বোম্বাই হামলায় মূল চক্রী আজমল কাসভের জন্য আর্থার রোড জেলেই তার অপারেশনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এবং তার বন্দীদশায় প্রায় ৪ বৎসরে ভারত সরকারের খরচ প্রায় ৭ কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল।

কিন্তু সুস্থ হলে কী হবে ছোট বাগানবাড়ির মধ্যে বন্দীজীবন প্রায় অসহ্য। বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না। বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াবার কোনও পরিস্থিতিও ছিল না। তাই তিনি জেল সুপার, আই জি কারা ও শ্রীনগরের জেলা মেজিস্ট্রেটকে আবেদন করলেন যাতে তিনি একঘণ্টা যেন বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন কিন্তু পুলিশ বাহিনী লিখিত অনুমতি ছাড়া সেটা নামঞ্জুর করে দিলো।

প্রথম অসুস্থ হওয়ার দু-সপ্তাহ পরে শ্যামাপ্রসাদ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই পায়ের যন্ত্রণা ও জ্বর। ডাঃ আলি মহম্মদ আবার এলেন। (ডাঃ আলি মহম্মদ বন্দীকে রোজ নিয়ম মাফিক পরীক্ষা করতেন না)। তিনি হিদার ভিলা থেকে ২০ মাইল দূরে থাকতেন এবং খবর দিলে তবেই আসতেন, নচেৎ নয়। ভারতীয় জেল কোড ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে বন্দীর পুরোপুরি শারীরিক নিরাপত্তা জেল কর্তৃপক্ষের দ্বিতীয় অসুস্থতার পর আবার সেই বেলেডোনা প্লাস্টার এবং ২-৩ দিন পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এরপর ১৬ জুন সর্দার হুকুম সিং এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হুকুম সিং-এর পরামর্শে শেখ আব্দুল্লা প্রেমনাথ ডোগরাকে শ্রীনগর সেন্ট্রাল জেলে থেকে বদলী করে দিলেন হিদার ভিলাতে। জম্মুর আন্দোলন প্রত্যাহার ব্যাপারে প্রেমনাথ ডোগরার সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন শ্যামাপ্রসাদ।

শরশয্যায় শ্যামাপ্রসাদ ঃ- কিন্তু কালান্তর ব্যাধি দেখা দিল ১৯ জুন রাতে। ওই রাতে শ্যামাপ্রসাদের পিঠে বেদনা শুরু হলো। সঙ্গে প্রবল জ্বর। পরদিন সকালেও জ্বর রইল সঙ্গে বেদনাও। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাঃ আলি মহম্মদ এসে পরীক্ষা করে বললেন রোগটা ড্রাই প্লুরিসি। এর আগে ৫-৭ বছর আগে (১৯৪৬ সালে) শ্যামাপ্রসাদের ওই রোগ হয়েছিল। ডাঃ আলি স্ট্রেপটোমাইসিন (Streptomycin) এই ঔষধটা এখন মিউজয়াম স্পেসিমেন হয়ে গিয়েছে, কারণ ওই ঔষধ আর চিকিৎসাশাস্ত্রে পৃথিবীতে কোথাও ব্যবহৃত হয় না। যদিও ওই ঔষধ আবিষ্করের জন্য আবিষ্কর্তা জার্মান চিকিৎসক নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ও কিছু

গুড়ো ঔষধ খাওয়ার ব্যবস্থা দিলেন। রোগীর রক্ত পরীক্ষার ও প্রস্রাব পরীক্ষার কথাও বললেন তিনি। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে তাঁর রক্ত পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা হয়নি।

শ্যামাপ্রসাদ ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে বললেন, তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে স্ট্রেপটোমাইসিন নিতে নিষেধ করেছেন, কারণ ওই ঔষধটা তার সহ্য হয় না। ডাঃ আলি মহম্মদ বললেন ওসব বহুদিন আগের কথা। এখন ঔষধটি সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। ডাঃ মুখার্জীর চিন্তিত হবার কোনও কারণ নেই। তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিকেল সাড়ে তিনটার সময় ডাঃ রাইনা তাকে ইনজেকশন দিয়ে গেলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তার অসুখের খবর জানানোর জন্য অনুরোধ জানালেন জেল সুপারকে। রাতটা খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটলো। পরদিন সকালে যন্ত্রণা ও জ্বর দুইই কমে গেল। দশটা নাগাদ আবার এলেন জেলের ডাক্তর। আবার ১ গ্রাম স্ট্রেপটোমাইসিন ইঞ্জেকশন দিলেন। এরপর সারাদিন ডাঃ আলি মহম্মদ জেলের ডাক্তার কাউকেই দেখা যায়নি। শুধু পুলিশের সাব-ইনস্পেকটার এসে খোঁজ খবর নিয়ে গেলেন।

রোগীর সেবার জন্য কোনও নার্সের ব্যবস্থা ছিল না। বিকেল চারটে নাগাদ রোগীর পিঠের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। জ্বরও উঠে যায় প্রায় ১০০ ডিগ্রীর উপর। যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে, রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ আরও এক পুরিয়া ঔষধ খাওয়ানো হয় তাঁকে। তাতে ব্যথার একটু উপশম হয়।

কিন্তু ২০ জুন ভোর চারটের সময় বুকের যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং তাঁর মাথাও ঘুরতে লাগল। ঘামে ভিজে গেল গোটা শরীর। ঘরের মধ্যে পরিচারিকাকে ডাক দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু সে এক ডাকে ওঠে না। কয়েকবার ডাক দিতে তবে তার ঘুম ভাঙ্গালো। তাকে বললেন পাসের ঘরের সহবন্দীদের ডেকে দিতে। তার তিনজন সহবন্দী ছিলেন তাঁরা হলেন, গুরুদত্ত বৈদ্য, টেকচাঁদ শর্মা ও প্রেমনাথ ডোগরা (শ্রী টেকচাঁদ শর্মা ছিলেন ডাঃ মুখার্জীর একান্ত সচিব)।

সহবন্দীরা পাহারারত হাবিলদারকে বললেন জেল সুপারকে ফোন করে ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করতে। ওই বাড়িতে কোন ফোন ছিল না। ফোন ছিল নিকটবর্তী ওয়াটার ওয়ার্কসে সেখানকার অফিস ঘরে। হাবিলদার সহবন্দী গুরুদত্ত বৈদ্যকে সঙ্গে নিয়ে অফিস ঘর খুলিয়ে ফোন করতে। জেল সুপারকে ফোন করে শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থার কথা জানানো হলো। ২১ জুন জেল সুপার সকাল সাড়ে সাতটায় এলেন সঙ্গে ডাঃ আলি মহম্মদ ও জেল ডাক্তার ডাঃ রাইনা। ডাঃ আলি মহম্মদ রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন প্লুরিস আগে থেকে অনেকটা সেরেছে। ব্লাড প্রেসার ও টেম্পারেচার কমে যাওয়ার দরুনই হার্টের অস্বস্তি দেখা দিয়েছিল। ডাঃ মহম্মদ যেহেতু রোগীর জীভের নীচে তাপাঙ্ক ৯৮ ডিগ্রি তাই ডাক্তার তাকে Coramine ইঞ্জেকেশন দিলেন। তারপর ডাঃ মহম্মদ বললেন, তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার

ব্যবস্থা করেন। গুরুদত্ত বৈদ্য বললেন একজন সহবন্দী যেন ডাঃ মুখার্জীর সঙ্গে থাকতে পারেন। জেল সুপার বললেন, তা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে শ্রীনগর হাইকোর্টে শ্যামাপ্রসাদের মুক্তির জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেই মামলার দেখ ভাল করার জন্য এবং শ্যামাপ্রসাদের সহকর্মী ও লোকসভার সদস্য উমাশঙ্কর ত্রিবেদী এসেছিলেন শ্রীনগরে কাশ্মীর হাইকোর্টের আদেশবলে সকলের সঙ্গে কথা বলার জন্য, সকাল সাড়ে দশটার সময় হেদার লজে এলেন তিনি। ২২ সেপ্টেম্বর তখন হেলান দিয়ে বসে আছেন। ত্রিবেদীকে দেখে বললেন আজ ভোর পাঁচটার সময় তো মারাই যাচ্ছিলাম।

ত্রিবেদীজি বুঝলেন শ্যামাপ্রসাদ খুবই অসুস্থ। শ্যামাপ্রসাদ বললেন একটু ভালো আছেন।

এগারোটা নাগাদ শ্যামাপ্রাসদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন ত্রিবেদীজি। পথে দেখা হলো জেল সুপারের। তারা একটি ছোট্ট গাড়ি করে আসছিলেন। জেল সুপার জানালেন তিনি শ্যামাপ্রসাদকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গেলেন রাষ্ট্রীয় হাসপাতালে।

সাড়ে ১১টার সময়ে জেল সুপার চারজনের বসার মতো ছোট্ট মোটর গাড়ি নিয়ে এলেন।

চেয়ারে বসিয়ে শ্যামাপ্রসাদকে সেই গাড়ীতেই তোলা হলো।

হেদার ভিলা থেকে রাষ্ট্রীয় হাসপাতাল ১০ মাইল দূরে। ওই দীর্ঘ পথ শ্যামাপ্রসাদকে বসিয়েই নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালে পৌঁছে কোনও স্ট্রেচার পাওয়া গেল না তাঁর জন্যে। হুইল চেয়ারেই দোতলায় তোলা হলে তাঁকে স্ত্রীরোগ বিভাগের ১২-১২ ফুট একটি ঘরই হলো শ্যামাপ্রাসদের নার্সিংহোম।

২২ জুন বিকাল পাঁচটায় কোর্টের কাজ শেষ হলে ত্রিবেদীজি জেলা মেজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানলেন যে কোন নার্সিংহোমে তাঁকে রাখা হয়নি। অবশ্য পরে জেলা মেজিস্ট্রেট তাঁকে নিয়ে গেলেন সরকারী হাসপাতালে। শ্যামাপ্রসাদ জানালেন তিনি আগের থেকে একটু ভালো আছেন। তিনি গোটা কয়েক চিঠি পড়লেন (একটি টেলিগ্রাম সমেত) এবং সই করলেন দুটো চেকেও।

তারপর ত্রিবেদীজি একটি চিঠির ডিকটেশনে শ্যামাপ্রসাদ সই করে করে দিলেন ওই চিঠিতে। ওই সাক্ষাৎকারের সময় শ্যামাপ্রসাদের পক্ষে যিনি আদালতে মুক্তির আবেদন পেশ করবেন সেই দেবীপ্রসাদ নাকাশীও উপস্থিত ছিলেন। ত্রিবেদীজি ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে শুধালেন, রোগীর অবস্থা কেমন বুঝছেন। উমাশঙ্করবাবু বেরিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে কিন্তু তাঁর মনে অস্বস্তি।

রাত্রি দুটোর সময় পুলিশ সুপার ত্রিবেদীকে ফোনে জানালেন যে শ্যামাপ্রসাদের অবস্থা খারাপ এবং জেলা মেজিস্ট্রেট তাঁকে হাসপাতালে উপস্থিত থাকতে বলেছেন।

রাত্রি আড়াইটার সময় ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদের ২৩ জুন ১৯৫৩ সালে এক শোচনীয় অবস্থায় তাঁর জীবনাবসান হলো।

সুপ্রীম কোর্টের এলাকা বহির্ভূত কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের বন্দীত্ব ও মৃত্যু দুইই তাঁর আটক সংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন। কাশ্মীর হাইকোর্টে তাঁর আটক সংক্রান্ত মামলার ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ প্রদর্শন করেছে যে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশাসন আমাকে আটক করেছে। অসৎ উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত নিম্নলিখিত ঘটনাবলী থেকে পাওয়া যায়।

(১) শেখ আব্দুল্লাকে আমার টেলিগ্রাম ও তার উত্তর তখন তিনি ভাবেননি যে আমার জম্মু পরিভ্রমণ এতোই বিপজ্জনক যে তাঁকে জননিরাপত্তা আইনের আওতার মধ্যে পরতে হবে।

(২) ভারত সরকার ও জম্মু সরকারের মধ্যে ষড়যন্ত্র, ভারতীয় অফিসাররা আমার জম্মু সফর মসৃণ করে দিয়েছিলো।

(৩) জম্মুতে আগে থাকতে তৈরী করা আদেশ ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা সেটা যখন সই করা হয়েছিল, তখন অভিযোগের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল না।

(৪) শেখ আব্দুল্লার বেতার ভাষণ বিনা অনুমতিতে রাজ্যে প্রবেশের জন্য আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কারণ ওইরকম কোন বিজ্ঞপ্তি রাজ্য সরকারের আগে জারী করেনি।

তথ্যসূত্র ও অতিরিক্ত তথ্য

১. ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

২. Sarvepalli Gopal,Jawaharlal Nehru; II, New Delhi, (1979), P. 125.

৩. Definations offered by Brass, Melson and Wo;pe, Esman Milton, and Kenneth W. Jones, respectively, quoted in Communal and Panislamic trends in Colonial India; Ed, Mushirul Hasan, New Delhi (1981) P. 313.

৪. Aziz Ahmad, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment; New Delhi (1999), P. 105.

৫. Elie Kedourie, Nationalism, Oxford (1993), P. 101.

৬. Ibid. P. 67

৭. কোরাণ, ৩/১০৩

৮. ঐ, ২১/৯২/২৩/৫২

৯. Sarvepalli Gopal, Ibid. I, P 175.

১০. মজাহাব – School of Jurisprudence

১১. কাজী অবদুল ওদুদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, (১৯৯৮)

১২. Hughes, Thomas Patrick, Dicgionary of Islam: Calcutta (1992), P.264.

১৩. Rafiuddin Ahemad, The Bengal Muslims; New Delhi (1988), P.111.

১৪. Ibid, P. 96

১৫. Ibid, P. 96

১৬. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস; কলকাতা (1402 B. S.) P.94

১৭. কোরাণ–৫/৪৫–৪৬

১৮. Asghar Ali Engineer, Ed, Role of Minorities in Freedom Struggle; New Delhi (1989), P. 23

১৯. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, P. 95

২০. Bamford, P.C. Histories of the Non Co-operation and Khilafat Movement, New Delhi (1974), P. 29

২১. Ibid.
২২. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, P.114
২৩. শংকর ঘোষ, হস্তান্তর কলকাতা ((1999), P. 121.
২৪. ঐ
২৫. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, ঝ। ১১৪
২৬. Asghar Ali Engineer, Ibid, P.11.
২৭. Mushriul Hasan, De. India's Partition; Process, Strategy and MObilization; New Delhi (1998), P. 147.
২৮. Sarvepalli Gopal Ibid 1, P. 299. Also Jawaharlal Nehru.The Discovery of India; New Delhi (1997). P. 147
২৯. Kaleidoscope, Vol-2, No. 8 March 1830, Published in Bengal : Early Nineteenth Century, Ed. Gautam Chattopadhyay, Calcutta (1978),. P.106.
৩০. Lal K. s. Muslim Slave System in Medieval India; New Delhi; (1994) P. 41-59
৩১. Maktubat-i Imam Rabbani, letter No. 81. Vol-1, Quoied in Rizvi, S.A.A. Muslim Revivalist Movement in Northern India; Agra, (1956). P. 206
৩২. Khan, M. A. History of the Faraidi Movement; Dacca (1984). P. 108
৩৩. সুনীলময় ঘোষ, অতুলপ্রসাদ, কলকাতা (1984), P. 108
৩৪. Sahi Muslim Hadis No. 4363 : It has been narrated on the authority of Abu Huraira who said; We were (siting) in the mosque whn theMessenger of Allah (may peace be upon him) came ot us and said; (Let us) go to the Jews. We went out with him until we came tothem. The Massenger of Allah (may peace be upon him) stood up and called out to them (sayint) : O ye assembly of Jews. accept Islam (and) you will be safe.They said. Abu'l Qasim, you have communicated (God's message to us). The Messenger of Allah (maypeace be upon him) said, I want this (i. e. you should admit that God's Message has been communicated to you), accept Islam and you sould be safe, they said; Abul Auasim, you have communicated (God's Message to us), The Messenger (may peace be upn him) said; I want this.....He said to them (the same words) the third time (and on getting the same reply he added; you should know than the earth belongs to Allah and his Apostle. and I wish that should expel you from this land. Those of you who have any porperty with them should sell it, otherwise they they should know that the earth belongs to Allah and His Apostle (and they may have to go away leaving everything behind). Also Sahi Muslim Hadis No. 4366; It has been narrated by Umar B. al

Khatab that he heared the Messenger of Allah (may peace be upon him) say; I will expel the Jews and Christians from Arabian Peninsula and will not leave any but Muslims.

৩৫. Jawaharlal Nehru. The Discovery of India, P. 347.

৩৬. Mushriul Hasan, Communal and PanIslamic Trend in Colonial India, P.72

৩৭. AL Hilal, 23.10.1913, Quoted in Communal and Panislamic Trend in Colonial India, P. 64-65.

৩৮. Ayeha Jalal, The Sole Spokesman, Cambridge (1985), P.53.

৩৯. Sobhog Mathur, Hindu Revivalism and Indian National Movement, Jodhpur (1996). P1.

৪০. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যুর রহস্য; কলকাতা (1991) P. 57.

৪১. Sobho Mathur, Ibid, P. 87

৪২. Ibid. P.92.

৪৩. Ibid. P.201.

৪৪. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, P.52

৪৫. শ্যামলেশ দাশ, দূরদর্শী রাজনীতিক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, কলকাতা (1997). P. 98.

৪৬. Leonard Mosley, Last days of British Raj, Bombay, (1968) P. 285.

৪৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, পূর্বোক্ত, P. 80

৪৮. Musirul Hassan, Indian's Partition. P. 134

৪৯. কোরাণ – ২/১৩৬

৫০. আর্নল্ড টয়েনবী ও দাইসাকু ইকেদা, সৃজনমূলক জীবনের দিকে; কলকাতা (১৯৯৪), (1994). P. 160, 163

৫১. কোরাণ – ৩/৮৫

৫২. Dilip Hiro, Islamic Fundamentalism; London (1988), P. 30.

৫৩. Aziz Ahmad, Ibid, P. 105.

৫৪. Bal Raj Mdhok, Jammu, Kashmir and Ladakh; New Delhi (1987).

৫৫. Ibid.

৫৬. Ibid. P. (Viii).

৫৭. Ibid. P. 19.

৫৮. Ibid. P.(vi)

৫৯. Ibid. P.(viii)

৬০. Gopal Ibid.(II) P. 18

৬১. Ibid.
৬২. পবিত্র কুমার ঘোষ, কাশ্মীর যুদ্ধের পূর্বাপর, বর্তমান, ৮.৬.৯৯
৬৩. Gopal Ibid.(II) P. 18
৬৪. Ibid. P.20.
৬৫. Ibid.
৬৬. Bal Raj Madhok, Ibid, P (iv).
৬৭. Ibid. P.30
৬৮. Ibid.
৬৯. Ibid. P.9
৭০. Ibid. P.11.
৭১. Gopal Ibid (II) P.20.
৭২. Ibid. (II) P.24.
৭৩. Ibid.
৭৪. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.106.
৭৫. Gopal Ibid (II) P. 33.
৭৬. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.106.
৭৭. Madhok, Ibid, P (xii).
৭৮. Ibid. P.119
৭৯. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.107.
৮০. স্বাধীনতার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলিম জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৩ ভাগ। কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত চট্টগ্রাম জেলার সংলগ্ন হওয়ার কারণে চাকমাদের দেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানকে উপহার দেওয়া হয়। বর্তমানে চাকমাদের ব্যাপকভাবে ইসলামায়িত করা হচ্ছে এবং তাড়না করা হচ্ছে।
৮১. দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় খুলনা জেলায় হিন্দুরা ছিল কিঞ্চিৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট খুলনাতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলেও দু'দিন পরে সংবাদ আসে খুলনা জেলা সংলগ্ন যশোহরের মতো পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে। ফলে খুলনা জেলার হিন্দুর ব্যাপকভাবে ভারতে উদ্বাস্তু হয়।
৮২. Gopal Ibid.(II) P. 112
৮৩. জওহরলালকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের চিঠি। 11.1.1953
৮৪. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.111
৮৫. Gopal Ibid.(II) P. 124

৮৬. Gopal Ibid.(II) P. 125

৮৭. Ibid.

৮৮. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.121

৮৯. Gopal Ibid (II) P.125

৯০. বীরেশ মজুমদার, শ্যামপ্রসাদ, কলকাতা (1376-BS.) P113.

৯১. শ্যামলেশ দাশ, পূর্বোক্ত, P.24.

৯২. Gopal Ibid (II) P.127

৯৩. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, P.270

৯৪. Gopal Ibid (II) P.129

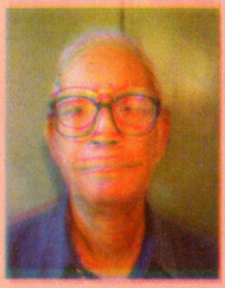

Dr. J. C. Pal was born on 1.10.1935 in a village at Dacca District of Bangladesh and his early education was at Agartala in the Tripura State of Indian Dominion. He was admitted to the MBBS course of C.U. at R. G. Kar Medical College of Calcutta.

He qualified as MBBS in 1958 and secured Honours' in Gynaecology and Obstetrics. He qualified as Fellow of the Royal College of Surgeons of England in 1963 and joined the Medical Educational Service and retired as HoD. (Surgery). He has authored several books in Surgery which were commended in the Journal of Royal College of Surgeons.

He is an avid reader in Political Science and Sociology.

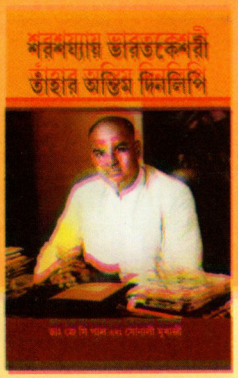

TUHINA PRAKASHANI
12C, Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700073
Phone : 033-2360-4306

ISBN : 978-93-5346-814-9